প্রথম অংশ।

চতুর্থ পর্ব্ব

সম্পূর্ণ।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলাষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৬ সাল।

ছবির তালিকা।

কালাচাঁদ।

চতুর্থ পর্ব্ব—মন্ত্রণা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আহারাদির পর, যথা-নিয়মে একটু বিশ্রাম করিয়া, ঠাকুরদাদা কাছারী গেলেন। তথায় কাজ-কর্ম্ম কিছুই করিতে পারিলেন না। অসুখ হইয়াছে বলিয়া, তাকিয়া ঠেস্ দিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, তিনি বসিয়া রহিলেন। কাহারও সহিত বিশেষ বাক্যালাপ করিলেন না। বাহ্য-দৃশ্যে বোধ হইল, তাঁহার বুকে যেন কিরূপ একটা বিষম ব্যথা লাগিয়াছে।

বৈশাখের বেলা। তথাচ পাঁচটা না বাজিতে-বাজিতেই, জজ সাহেব উঠিবার পূর্ব্বেই, ঠাকুর-দাদা পাল্কী চড়িয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ঘরে আসিয়াই শুনিলেন, কালাচাঁদ এই মাত্র বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শুষ্ক মুখ আরও শুষ্ক হইল;—শরীরে স্বাস্থ্য নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই,—সদাই কেমন অন্যমনস্ক-ভাব। লোকের সহিত দুই একটা কথা কহিলেন বটে, কিন্তু সে-কথা কেমন ছোড়ভঙ্গ,—আদি-অন্তে মিল নাই! বাটীর ভিতর সন্ধ্যাহ্নিক করিতে গেলেন বটে,—কিন্তু নিয়মিত জলখাবার খাইলেন না;—বলিলেন, ক্ষুধা নাই, অম্বলে কেমন বুকটা জ্বালা করিতেছে!

বাহিরে আসিয়া, তিনি এক তাকিয়া ঠেস্ দিয়া পড়িলেন।

প্রাতঃকালের কথা-মত রামঠাকুর বহুপূর্ব্বেই, বেলা চারিটা না-বাজিতেই, দেওয়ানজীর বাসায় আসিয়া ঘুঘু-পক্ষীটীর মত বসিয়াছিলেন। কাছারী হইতে প্রত্যাগমন-কালে দেওয়ানজীর পাল্কীর শব্দ

পাইয়া, রামঠাকুর তাঁহাকে আগবাড়াইয়া আনিতে পথে দৌড়িয়া যান। পাল্কী হইতে নামিয়া কর্ত্তা কিন্তু তাঁহার সহিত কোন কথা কহিলেন না। রামঠাকুর কর্ত্তার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ বৈঠকখানার উপর আসিলেন। কাছারীর কাপড় ছাড়িয়া কর্ত্তা অন্দরে জল খাইতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া, তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিলে, ব্রাহ্মণ-রামঠাকুর, কায়স্থ-কর্ত্তার ঠিক পদপ্রান্তে গিয়া উপবেশন করিলেন। কর্ত্তা তথাচ কোন কথা কহিলেন না। তখন রাম-ঠাকুরের পেট ফুলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কর্ত্তা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা-সুরে বলি-লেন, "ঠাকুর-মোশাই! আমার কপালে হাত দিয়া দেখ'ত, গরম হয়েচে কি না?"

রামঠাকুর কপালে হাত না দিতে-দিতেই বলিয়া উঠিলেন, "উঃ, খুব গরম দেখ্‌চি যে। ভয়ঙ্কর গরম।"

বাস্তবিক তখন কর্ত্তার মাথা বা কপাল তাদৃশ গরম ছিল না। বৃদ্ধবয়সে, সন্ধ্যাকালে, দুর্ভাবনার

সময় যেরূপ স্বাভাবিক একটু ঈষৎ গরম হয়, সেইরূপই হইয়াছিল। তবে রামঠাকুর এরূপ অত্যধিক গরমের কথা বলিলেন কেন?

রামঠাকুর কর্ত্তার হৃদয় বুঝিতেন। কর্ত্তার অভিপ্রায় ছিল, তাঁহার কপালটাকে এ-সময় সকলে গরম বলুক। কাজেই রামঠাকুর, কপাল গরম না হইলেও, উহাকে গরম বলা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। বিশেষ, কর্ত্তা যদি বলেন, আমার অমুক অসুখ করিয়াছে;—তদুত্তরে কেহ যদি প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "না, ও কিছু নয়,—আপনি বেশ আছেন";—তাহা হইলে কর্ত্তা প্রকৃতই দুঃখিত হন, কখন বা রাগও করিয়া থাকেন।

কপালটী ভয়ঙ্কর গরম সাব্যস্থ হইলে, কর্ত্তা আবার বলিলেন, "আমার বুকটা খুব জ্বালা করিতেছে, বোধ হয় আজ ভারি অম্বল হয়েছে।"

রামঠাকুর অমনি কর্ত্তার বুকে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "হাঁ, বটে, বুকটা খুবই জ্বালা করিতেছে;—এত অম্বল হ'লো কিসে?"

ঠাকুরদাদার অম্বলের অসুখ।
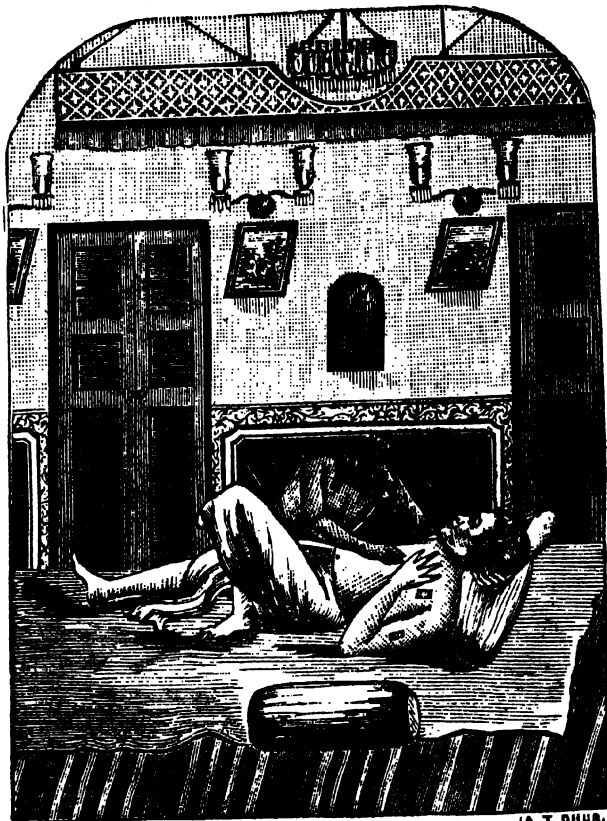
কর্ত্তা। আজ দ্বিপ্রহরে গুরুপাক জিনিষ ভোজন হয়েছে,—

রামঠাকুর। আপনি খেলেন কেন? আপনি গিন্নীর কথা শুনেন কেন? আহা! গৃহিণী নন্ ত—যেন সাক্ষাৎ ভগবতী! গৃহিণীর গুণেই সংসার! আমি বাড়ীর ভিতর খেতে ব'স্‌লে, গিন্নী বামুনকে ব'লে দেন, "ঠাকুরের পাতে আরও সন্দেস দে, আরও সন্দেস দে!" আমি খেতে পার্‌বো না, তবু গিন্নী ছাড়্‌বেন না। আহা! এমনি তাঁর লোকের প্রতি স্নেহ-যত্ন।

কর্ত্তা এ-সব কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "দেখ, ঠাকুর-মোশাই! আজ বড় অসুখ হয়েছে—"

রামঠাকুর। (বিস্ময়ে) বলেন কি? বলেন কি? ছিরাম কবিরাজকে ডেকে আনৃব নাকি? চাদর লইব নাকি? অসুখইত বটে,—তাই'ত!—ঘোরতর অসুখ!

কর্ত্তা। না, এখন আর কবিরাজ ডাকিতে

হইবে না। একটু ঘুমাইলেই সারিতে পারে। একবার ঘুমাইবার চেষ্টা দেখি,—

এ কথা শুনিয়া রামঠাকুর বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বড়কর্ত্তার অসুখ হইয়াছে,—দেওয়ানজীর অম্বলে প্রাণ যায়-যায় হইয়াছে;—এই ব্যাপার লইয়া অন্তত রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তিনি একটা হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিবেন। কবিরাজ আসিলে, তাঁহার নিকট হইতে বল-বৃদ্ধির একটী বটিকা লইয়া তিনি নিজে খাইবেন। অন্দরের দ্বারে একবার দৌড়িয়া গিয়া গিন্নীকে উদ্দেশ করিয়া সংবাদ দিবেন, "কর্ত্তার অসুখ একটু কমিয়াছে, কবিরাজ আসিয়া ঔষধ দিয়াছেন, কোন চিন্তা নাই।"—কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কামনাই পূর্ণ হইল না।

দুঃখের উপর দুঃখ। কর্ত্তা যদি ঘুমাইয়া পড়েন, তাহা হইলে ত ভোলা-ময়রার কথা, মনোমোহিনী ময়রাণীর কাহিনী, দোকানে চাবি ভাঙ্গা, সন্দেস খাওয়া—এ-সব কথা ত

উত্থাপন করা হইল না! না জানি, কি অশুভ-ক্ষণেই অদ্য যাত্রা করিয়াছিলাম। বারবেলায় কি বাহির হইয়াছিলাম?—

রবৌ বর্জ্জ্যং চতুঃপঞ্চ
সোমে সপ্তদ্বয়ং তথা।

তাহাও নহে! বোধ হয় যাত্রাকালে কেহ হাঁচিয়া থাকিবে! অথবা পথে ধোবা দেখিয়া থাকিব!

রামঠাকুর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,—এমন সময় কর্ত্তা আবার বলিলেন, "ঠাকুর-মোশাই! তুমি যাবার সময় চাকরদিগে ব'লে যাওত, আমার কাছে যেন কোন লোকজন আজ না আসে। কেহ জিজ্ঞাসিলে চাকররা যেন বলে 'কর্ত্তার অম্বলে বুকজ্বালা ক'রে অসুখ হয়েছে, তাই তিনি ঘুমিয়েছেন।'"

রামঠাকুর। হঠাৎ এমন অসুখটা কিসে হলো?

কর্ত্তা, সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলি-লেন, "যদি কালাচাঁদ আসে, তবে তাকে না হয় আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে ব'লো।"

রামঠাকুর ভাবিতে লাগিলেন, "তাই'ত!—গতিক কি?—আমাকেও উঠিয়ে দিতেছেন!—আস্‌বে কি না সেই কালাচাঁদটা?—সেটার সঙ্গে এত ভাব কিসে হ'লো?—"

কর্ত্তাকে কোন বিষয়ে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার তাদৃশ ক্ষমতা রামঠাকুরের নাই। কাজেই তিনি কালাচাঁদ-সম্বন্ধিনী কোন কথা কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিতে সক্ষম হইলেন না।
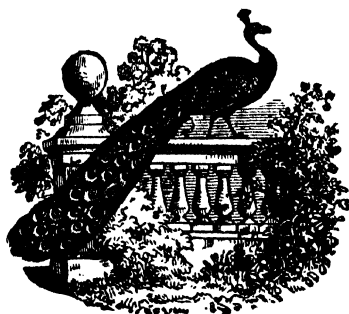
রামঠাকুরের ঠাকুরদাদা—দর্শন।
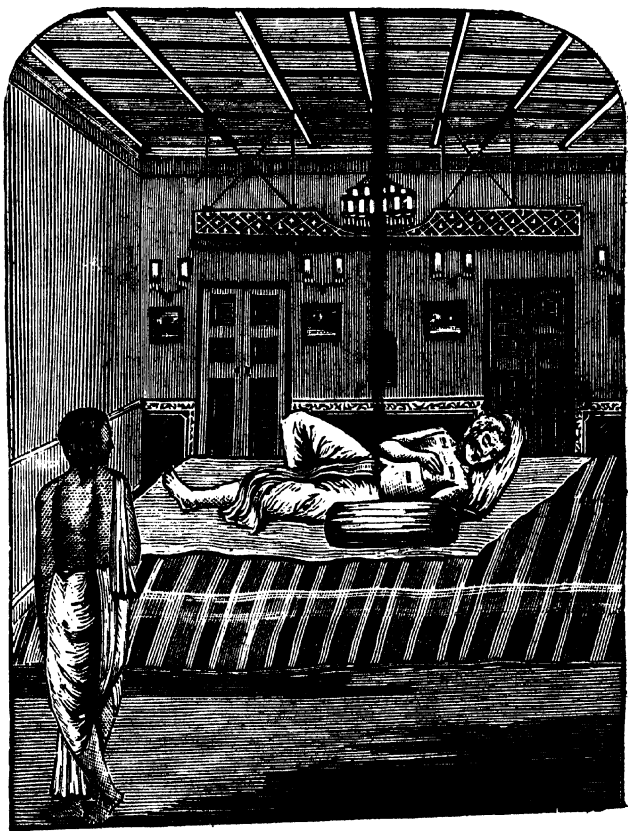
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামঠাকুর কি করেন,—উঠিয়া যাইতেই বাধ্য হইলেন। তথাচ তিনি উঠিতে একটু বিলম্ব করিতে লাগিলেন।—ইচ্ছা,—যদি এইটুকু সময়ের মধ্যে কর্ত্তা তাঁহার সহিত আরও দুই একটী কথা কহেন। কর্ত্তা কিন্তু নীরবই হইয়া রহিলেন,—আর একটীও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। তখন অগত্যা রামঠাকুর উঠিলেন,—দাঁড়াইলেন। এমনি ধীরে ধীরে আলস্যের সহিত দাঁড়াইলেন, যেন, দাঁড়াইতেও দুই মিনিট সময় লাগিল। তার পর, পদবিক্ষেপ। এই প্রথম পদক্ষেপেও বুঝি এক মিনিট সময় অতিবাহিত হইল। অনন্তর, মুখ ফিরাইয়া পশ্চাৎদিক্ সন্দর্শন। "শুন, ঠাকুর-মোশাই, শুন, বলি"—কর্ত্তা তাঁহাকে এই বলিয়া ডাকিবার উপক্রম করিতেছেন কি না, বুঝি ইহা দেখাই তাঁহার পশ্চাতে মুখ ফিরাইবার উদ্দেশ্য।

তদনন্তর এককালে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পদ-বিক্ষেপ। অতঃপর উঁকিঝুঁকি মারিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত। দেখিতে দেখিতে রামঠাকুর উঠানে গিয়া পড়িলেন।

রামঠাকুর অবশেষে দেখিতে পাইলেন, কাঁধে চাদর ফেলিয়া দ্রুতপদে একটা লোক আসিতেছে।

রামঠাকুরকে কোন কথা কহিতে হইল না; সে লোকটা ঈষৎ দৌড়িয়া আসিয়া দড়াম্ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া, এই ভাবে কাতর কণ্ঠে, বলিল, "আপনারা আমায় রক্ষা করুন, আমি ধনে প্রাণে মরিলাম।"

রামঠাকুর। কেহে! ভোলানাথ নাকি? হাঁ—হাঁ, সব শুনেচি! একটু আস্তে কথা কও। কর্ত্তার বড় অম্বলের অসুখ করিয়াছে। বোধ হয়, তাঁর একটু নিদ্রা এসে থাক্‌বে।

ভোলানাথ। আজ্ঞে, আমি কত্তা-মোশায়েরই শরণ নিতে এসেচি। তিনিই দেশের রাজা,—

রামঠাকুরের চরণে ভোলানাথের পতন।

A. T. DHUR

আমরা তাঁর সন্তান তুল্যি। তিনি না রাখলে, আমাদিগকে আর কে রাখ্‌বে?

রামঠাকুর। ঠিক,—ঠিক!

ভোলানাথ। আমি গরীব মানুষ; কোথা কি পাবো? কত্তা মোশায়ের জন্যে এই আটটী টাকা নজর এনেচি। এই ক্ষুদ-কুঁড়ো কটী পান খেতে নিয়ে আমাকে রক্ষা কত্তে হবে।

এই বলিয়া ভোলানাথ ট্যাক্ হইতে টাকা খুলিয়া লইয়া হাতে রাখিল।

কর্ত্তা এতক্ষণ নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া নীরবে নিদ্রিত ছিলেন। টাকার শব্দ শুনিয়া জাগিলেন। চক্ষু চাহিয়া বলিলেন, "ভোলা নাকিরে!"

ভোলানাথ। আজ্ঞে, কত্তা-মোশাই, আমাকে এ-যাত্রা রক্ষা কত্তে হবে।

এই বলিয়া ভোলানাথ কর্ত্তার নিকট পৌছিল।

কর্ত্তা। তোর কি হয়েচে?

ভোলানাথ। সে কথা আর কি বল্‌বো?

এই বলিয়া ভোলানাথের ক্রন্দন।

কর্ত্তা। বল্না কি হয়েচে? কেবল কাঁদ্‌লে কি হবে?

ভোলানাথ। আজ্ঞে, কাল রাত্রে কখন্ আমার দোকানে চুরি হয়েচে, তার আমি বাপ্প কিছুই জানি না। একখুলি রসগোল্লা চোরে খেয়েছে, এক৺াড়ী ক্ষীর খেয়েচে, আর বাক্সভেঙ্গে নগদ ৯৲ টাকা নিয়েচে।

কর্ত্তা। তোর বাক্সে কত টাকা ছিল?

ভোলানাথ। একষট্টি টাকা সাড়ে বার আনা ছিল।

কর্ত্তা। এ কি রকম কথা হ'লো? ৬১৸১০ টাকার মধ্যে চোর লইল ৯৲,—বাকী টাকা রাখিয়া গেল কেন?

ভোলানাথ। এই জন্যই ত আজ মারের চোটে আমার পিঠের চামড়া উঠে গেছে! চোরে ৯৲ টাকা নিলে,—১০৲ টাকা নিলে না, কি ১৫৲ টাকা নিলে না, কি সব টাকাই নিলে না,—তার আমি কি কর্‌বো? চোরের মনের মৎলব আমি

কি ক'রে ব'ল্‌বো? কত্তা-মোশাই! আপনি তো দেশের রাজা,—আপনিই এর্ বিচার করুন।

কর্ত্তা। আচ্ছা, তোর্ মার্ খেয়ে পিঠের চামড়া গেল কেন?—তোকে মেলে কে?

ভোলানাথ। আজ্ঞে, এই, দারোগা-মোশাই মেলেন। তিনি ব'ল্লেন,—বল্‌ এখনি,—কে চুরি করেচে? না ব'ল্লে, এখনি তোকে কড়ীকাঠে টাঙ্গিয়ে তোর্ এক হাত জিব বা'র্ ক'রে ফেল্‌বো।

কর্ত্তা। তার পর কি হ'লো?

ভোলানাথ। আজ্ঞে, আমি তাঁকে বুঝিয়ে ব'ল্লাম,—'চোর কে,—তাই যদি আমি জান্‌বো, তবে আমি থানায় খবর দিতে আস্‌বো কেন? জান্‌লে,—একবারে চোরের টুটী ধরে এনে, তাকে জেলখানায় সাঁদ ক'রে দিতাম।' এই কথা শুনে, দারোগা-মোশাই আরও রাগ ক'রে বল্লেন, "ভোলা, তুই বেটা পাকা বদমাইস্‌,—সোজা কথায় বল্‌বি ত বল্‌, নইলে তোর্ পিঠে ২৫ জুতো লাগাবো।" এই কথা শুনে আমি ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লাম,—

যোড়হাতে দারোগা-মোশাইকে ব’ল্লাম, ‘দোহাই খোদাবন্দ! আমায় রক্ষা করুন,—আমি এর ভাল মন্দ কিছুই জানি না।’

কর্ত্তা। তার পর—

ভোলানাথ। দারোগা-মোশাই আরও রাগ ক’রে খুব চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, “ভোলা! তুই ব্যাটা, ছেলে-ভুলুস্ কা’কে? নৌকা-ভাড়া ক’রে চোর এসে বাক্স-ভেঙ্গে ৯৲ টাকা নিয়ে গেল, আর ৫২৸১০ টাকা তো-ব্যাটার জন্যে রেখে গেল—নয়?—ভোলা! তুই ন্যাকা বুঝুস্ কা’কে? নিশ্চয় তুই নিজে চুরি করেচিস্—নয়,—চোর তোর ঘরেই আছে?—চোরে চুরি কত্তে এলে, পাহারাওয়ালাদের কাছ থেকে সে কি আর ফিরে যেতে পাত্তো? এটা চুরি নয়,—যেন একটা রঙ-তামাসা পড়ে গেছে,—মার্ শালাকে!”

ভোলানাথ এইবার আওয়াজ একটু গম্ভীর করিল। ধীর-স্বরে সাধুভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—“দেওয়ানজী-মোশাই! আপনি

ধম্মাবতার। ঐ উপরে ভগবান্, নীচে আপনি। আপনার কাছে আমি মিথ্যে কথা বল্‌বো না। দারোগা-মোশাই, একজন চৌকীদার দিয়ে, জুতো মেরে আমার পিঠ ছিড়ে দিয়েচেন! পিঠ ফেটে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌লো। তখন আমাকে রোদে বসিয়ে রাখ্‌লেন। আমি কি করি,—বেলা যখন তিতীয় পহর, তখন পাঁচটী টাকা দারোগা-মোশাইকে পান-খেতে দিয়ে তবে বাড়ী আস্‌তে পাই। দারোগা-মোশাই ব'লে দিয়েচেন, 'চোরের সন্ধান তোকে ক'রে দিতেই হবে!—যদি আজ একান্ত চোর না পা'স্, তবে কাল তোকে চোরকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌তেই হবে!' এ বিপদে আর কার কাছে যাবো?—তাই আপনার কাছে এসেচি,—আপনি ছিমধোসূদন,—আমাকে রক্ষা করুন।"

এই বলিয়া ভোলানাথ কর্ত্তার পদপ্রান্তে তাহার মস্তক ন্যস্ত করিল। কর্ত্তা বলিলেন, "ভোলা! ওঠ্, ওঠ—ভয় কি?"

ভোলানাথ আটটী টাকা কর্ত্তার বিছানায় রাখিয়া দিল।

কর্ত্তা বলিলেন, "ও—কি—ও?—"

ভোলানাথ। আজ্ঞে, এই পান-খেতে যৎকিঞ্চিৎ নিয়ে এসেচি—

কর্ত্তা। টাকা তুই ফিরে নিয়ে যা,—টাকায় আমার কাজ কি? হেঁরে ভোলা! তোকে কি আর আমায় টাকা দিতে হয়?—

ভোলানাথ। (যোড়-হাতে) আজ্ঞে, আপোনার ছিচরণ মনে করে এই ক্ষুদ-কুঁড়ো-কটী এনেচি,—এ আপনাকে নিতেই হবে—

কর্ত্তা। ওরে ভোলা! তুই আগে খালাস হ',—তারপর আমাকে না হয়,—দুসের সন্দেস দিস্,—টাকা এখন ফিরে নিয়ে যা—

ভোলানাথ। আজ্ঞে, হুজুর! ছোট ধামি ক'রে আজ আড়াইসের সন্দেস আপনার জন্যে আন্‌-ছিলেম,—বাঁ-কাঁধে ধামিটী বসানো ছিল, সন্ধ্যে তখন হয়ে গেচে,—ঠিক বারোদোয়ারির কাছে,

একটা লোক পেছুপেছু এসে ধামিটী তুলে নিয়েই দৌড় মার্‌লে! আমার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না,—আমি অম্‌নি 'থ' হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেম্।

কর্ত্তা। বলিস্ কিরে? সত্য না কি?—

ভোলানাথ। দেওয়ানজী-মোশাই! এ চূণের ঘরে আমি মিথ্যে কথা বল্‌বো না,—আমি লজ্জায় ও ভয়ে এতক্ষণ এ কথা বলি নাই। দারোগা-মোশাই যদি শোনেন, তা'হলে বোল্‌বেন,—তুই এ চোরটাকেও ধ'রে নিয়ে আয়্।

কর্ত্তা। সন্দেসের ধামি তুলে নেবার পর, তুই কি কোন কথা কইলি না?—

ভোলানাথ। আজ্ঞে, একটু পরে, আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেম,—'চোর! চোর! ঐ সন্দেস নিয়ে যায়, —সন্দেস নিয়ে যায়।' সে চোরটা, ঠিক যেন যমদূতের মত। হি-হি ক'রে একটা বিতিকিচ্ছি হেসে, বাঘের মত লাফ দিতে দিতে, পাশের গলির ভিতর ঢুকে গেল।

কর্ত্তা। আশ্চর্য্য কাণ্ড বটে। সন্ধ্যাবেলা সদর-রাস্তায় ডাকাতি!! লোকের রাস্তা-চলা ভার হলো দেখ্‌চি।

ভোলানাথ। লোকের আর কি হচ্চে? আমারই উপর শনির দিষ্টি পড়েচে,—কাল রাত্রে আমারই ঘরে চুরি হলো, আজ রাত্রে আমার হাতথেকে সন্দেসের ধামি তুলে নিয়ে গেল। এই দেখুন্‌না, দেওয়ানজী-মোশাই!—হুগলী সহরের মধ্যে আর কার কি হয়েচে?

রামঠাকুর এতক্ষণ নীরব ছিলেন। তিনি পুলকে পূর্ণ হইয়া, একান্তমনে, এই গুরুগল্প শুনিতেছিলেন। কিন্তু তিনি আর থাকিতে পারি-লেন না,—বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, কর্ত্তা-মোশাই! একটা মজা দেখেচেন,—সন্দেসই কেবল চুরি হচ্চে!! টাকাকড়ি গেল,—সোণা-দানা গেল,—চুরি হচ্চে কেবল ক্ষীর, সন্দেস, আর রসগোল্লা! যেন রঙ্গরসের তরঙ্গ-বয়ে চলেচে। এটা চুরি নয়,—ঠিক যেন শালা-ভগিনীপতির তামাসা আরম্ভ

হয়েচে!—ভোলানাথ! তুমি ঠিক্ ব'লো, এর ভিতর গুপ্ত রহস্য আছে কি না? কর্ত্তার কাছে সে সব কথা বল্‌তে দোষ নাই!—আর এখানেই বা অন্য কে আছে?

এইরূপ কথা কহিতে পাইয়া, রামঠাকুরের অন্তরে আর আনন্দ-রস ধরে না,—যেন উপ্‌চিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। যিনি পলকার্দ্ধ-কালের জন্য বসিবার তিলার্দ্ধ মাত্রও স্থান প্রাপ্ত হন নাই, এক্ষণে তিনিই এককাঠা-প্রমাণ স্থান-জুড়িয়া বসিয়া অনন্ত সময় প্রাপ্ত হইলেন;—তাঁহার আনন্দ হইবে না ত কি? যিনি হৃত-সর্ব্বস্ব, অবমানিত হইয়া বিতাড়িত হইতেছিলেন, তিনিই এখন রাজ-রাজেশ্বর হইয়া সর্ব্বসুখভোগ করিতে লাগিলেন;—তাঁহার আনন্দ হইবে না ত কি?

ভোলানাথ, রামঠাকুরের কথায় যোড়-হাতে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, আমি গরীব-মানুষ;—আমার শালাও নাই, ভগ্‌গিন-পো'তও নাই! ঠাকুর-মোশাই! আমি কিছুই জানি না!—

আমি আপ্‌নাদের শরণ নিয়েচি, আমাকে রক্ষা করুন!”

রামঠাকুর। তুমি আমার কাছে মিথ্যা ব’লো না!—আমি সব জানি। তার আর লজ্জা কি?—খুলে বল,—কোন ভয় নেই!

ভোলানাথ। (ম্লানমুখে) ঠাকুর-মোশাই! আমি সত্যিই বল্‌চি—আমি ভাল মন্দ কিছুই জানি না।—আমি বড় গরীব!

ভোলানাথের চক্ষু দিয়া টস্‌-টস্‌ জল পড়িতে লাগিল। ভোলানাথের ভাবনা হইল, এ-যাত্রা বুঝি আর উদ্ধার নাই! আমি বুঝি ধনে প্রাণে মজিলাম! ও-বেলা দারোগা আমায় আধ-মারা করেচেন! এ-বেলা, রামঠাকুরও ঠিক সেই সুরে কথা আরম্ভ করেচেন। এখানেও কি আমাকে শেষে মারখেতে হবে?

ব্যাপার কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া, কর্ত্তা বলিলেন, “ভোলা! তুই আজ ঘর যা! তোর কোন ভয় নাই। আমার বড় অসুখ করেচে—”

ভোলানাথ। আজ্ঞে, আমি তবে চল্‌লাম! কিন্তু এ গরীবকে ভুল্‌বেন না! আমি বড় গরীব! আমার কেউ নাই!

ভোলানাথ উঠিবার উপক্রম করিল। কর্ত্তা কহিলেন, "টাকা রেখে যাচ্চ যে!"

ভোলানাথ দন্ত বাহির করিয়া কাতরস্বরে কহিল,—"আজ্ঞে—আজ্ঞে!—উটী গরীবকে মাপ কর্‌তে হবে! টাকা আমি এ রাজ-কাছারি থেকে নিয়ে যেতে পার্‌বো না—"

কর্ত্তা। ওরে পাগল! তুই আগে খালাস হ'; তা, দেখে আমার আহ্লাদ হোক্। তার পর বিশ পঁচিশ টাকা খরচ ক'রে ৺ মদনমোহনের এক-দিন মোচ্ছব দেওয়া যাবে।

ভোলানাথ। আজ্ঞে! তবে ঠাকুরের মোচ্ছবের জন্য এখন ৮৲ টাকা রৈল। কাল সকালে আর ১২৲ টাকা আন্‌বো। তা,—এসবই আপনার কাছে গচ্ছিত থাক্‌বে।

কর্ত্তা আর কোন কথা কহিলেন না।

ভোলানাথ স্বগৃহে প্রস্থান করিল। রামঠাকুর ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "তাই'ত—ভোলাবেটাও পালালো! এখন করি কি? উপায় কি?"

বাস্তবিকই রামঠাকুরের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। দীনদরিদ্রের হস্তে হঠাৎ একটী সাত-রাজার ধন মাণিক আসিল; কিন্তু অর্দ্ধদণ্ডপরে সে মাণিকটী উড়িয়া পলাইল। রামঠাকুরের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ। ইহাতে তাঁহার কষ্ট না হইবে কেন?

কর্ত্তা কহিলেন, "ঠাকুর-মোশাই! তবে তুমি যাও।—চাকরদিগে সে কথাটা বলে যেয়ো—"

রামঠাকুরের একটু যেন অভিমান হইল। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-ঠাকুরদাদার উপর শ্রীরাধা-রামঠাকুরের যেন দুর্জ্জয় মান উপস্থিত হইল। বৃন্দাবন-বিলাসিনী শ্রীমতী-ঠাকুর-মোশাই এতক্ষণ বাঁকা বংশীধর শ্রীযুক্ত হরিতারণ দত্তকে একমুহূর্ত্ত না দেখিলে বাঁচিতেছিলেন না,—কিন্তু যাই অভিমান উপ-

জিল, অমনি কৃষ্ণপ্রেম ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন।

একটা চাকর কর্ত্তাকে দেখিতে আসিল। কর্ত্তা বলিলেন, "প্রদীপটা নিবাইয়া দিয়া কপাট বন্ধ করিয়া যাও।"

কার্য্য, কথানুযায়ী সম্পন্ন হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেহ যেন মনে না করেন, কর্ত্তার প্রকৃতই আজ অম্বলে বুকজ্বালা করিতেছে। কর্ত্তা বিকারী-রোগীর ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া আছেন বটে, কিন্তু ইহা জ্বর-বিকার নহে। পণ্ডিতগণ ইহাকে মানস-বিকার কহিয়া থাকেন। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে এ রোগের প্রকৃতি বড়ই ভয়ঙ্করী। জ্বর-বিকারের ঔষধ আছে, কিন্তু এ-বিকারের ঔষধ নাই।

মানস-বিকারে রোগী শীঘ্র প্রাণে মরে না বটে, কিন্তু অষ্টপ্রহর যন্ত্রণায় অস্থির হয়। কিছুতেই সুখ নাই, স্বস্তি নাই, সব শূন্যাকার। কাহারও সহিত কথা কহিতে বা কাহারও কথা শুনিতে, ভাল লাগে না। প্রিয়জন বিরক্তিভাজন হয়। অঙ্গে চন্দন লেপিলে, গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। ক্ষুধা-মান্দ্য হয়। পিপাসা বৃদ্ধি হয়। কণ্ঠ শুষ্ক হয়। বুক ধড়্‌ধড়্ করে। রাত্রে অনিদ্রা ঘটে। মাথা ঘুরিতে থাকে। মন ত্রাস-যুক্ত হয়।

হয়, মাটীতে মুখ গুঁজিয়া, চোখ বুজিয়া, চুপ করিয়া কেবল পড়িয়া থাকি, আর ভাবি। কিন্তু তাহাতেও সুখ নাই। প্রাণ কেমন আইঢাই-ছট্‌ফট্‌ করে। তখন মনে হয়, বুঝি গড়াগড়ি দিলেই ভাল থাকিব।

এইরূপ যন্ত্রণায় কাল কাটিতে থাকে। সহজে মৃত্যু হয় না। যেন তুষানলে অঙ্গ অল্পে অল্পে ধীকি-ধীকি পুড়িতে থাকে।

শ্রীযুক্ত রায় হরিতারণ দত্ত বাহাদুর—দেওয়ান-মহাশয়ের মানস-বিকার অদ্য কতমাত্রায় উঠিয়াছে, তাহা সু-সূক্ষ্মরূপে সু-পরীক্ষা করিয়া দেখা নাই-ই হউক, মোদ্দা তিনি এ-পাশ ও-পাশ ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন।

এতই যদি তাঁর কষ্ট, তবে তিনি ভোলা-ময়রার সহিত কথা কহিলেন কেন? সুহৃদপ্রবর রাম-ঠাকুরকেও যিনি কাছে বসিতে দিলেন না, তিনি ভোলা-ময়রার সঙ্গে অর্দ্ধদণ্ডের অধিক কাল বাক্যালাপ করিলেন কেন?

রামচন্দ্রের সীতা, ‘প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী’। দেওয়ানজীর টাকা—প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী। বালক-বয়স হইতেই তিনি পয়সা ভাল বাসিতেন। আম-রুল শাকের রস দিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া, ময়লা-পয়-সাকে তিনি চক্‌চকে করিতেন। ঝক্‌ঝকে রগ্‌রগে টাকা ভিন্ন, অপরিষ্কার টাকা তিনি কাহারও নিকট হইতে লইতেন না। কোথাও টাকার ঝুন্‌ঝুন্‌ শব্দ হইলে সেই দিকে কাণ পাতিয়া থাকিতেন;—প্রেমিকের নিকট অপ্সরা-কন্যার নূপুর-নিক্কণের ন্যায়, সে ধ্বনি তাঁহার নিকট সুমধুর, সুন্দর, সুখদ বোধ হইত।

ভোলাময়রা প্রথম যখন রামঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তা কয়, কাতর হইয়া ‘রক্ষা কর, রক্ষা কর’ —ইত্যাকার শব্দ করে, কর্ত্তা তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বোধ হয় নিদ্রিতই ছিলেন,—বোধ হয় নিদ্রাবস্থাতে বড়ই বিরক্ত হইতেছিলেন। কিন্তু টাকার শব্দে এবং টাকার কথায় তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, নয়নদ্বয় উন্মীলিত হইল। তখন ভোলা-

নাথের সকল কথাই তাহার কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। ভোলানাথের মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে রতিপতি কামের ন্যায় কমনীয় বোধ হইতে লাগিল। এত যে যন্ত্রণা, এরূপ যে সহস্র বিছার দংশন,—কিছু ক্ষণের জন্য কর্ত্তা বোধ হয় সমস্তই বিস্মৃত হইলেন। একটী হউক, আধটী হউক, লক্ষ হউক, কোটী হউক,—তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,—টাকা-জিনিসটাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্ব-ব্যাধি-হর, সর্ব্ব-সুখাকর, এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সামগ্রী।

ভোলাময়রা চলিয়া গেলে কাজেই কর্ত্তা আবার এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

ব্যাধির কারণ কি?—কিসে হঠাৎ এরূপ নিদারুণ মানস-বিকার উপস্থিত হইল।

ব্যাধির কারণ,—কালাচাঁদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তা ভাবিতেছেন, "করি কি? উপায় কি? মনে মনে যাহা যাহা ঠিক করিয়া রাখিলাম, সবই কি তাহার বিপরীত হইল? ভাবি এক, হয় অন্য। কেন এমন হয়? এই সুবর্ণ কলসপূর্ণ বিশুদ্ধ দুগ্ধে কেন এক বিন্দু গোমূত্র পতিত হইতে দিব? পূর্ণিমার শশধরে কলঙ্ক-কালী কেন থাকিতে দিব? এই সোণার সংসারে এই দুরন্ত কালসাপকে কেন বাস করিতে দিব? আজ পাঁচিশবৎসর কাল'ত এই চেষ্টাই স্বতঃপরতঃ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু মনোরথ পূর্ণ হইতেছে কৈ? তবে কি সত্যসত্যই বাসনা ফলবতী হইবে না? তবে কি এই বিভীষণ বিষধরই আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে?

"তাও কি কখন হয়? আমি জীবিত থাকিতে,—এই হরিতারণ দত্তের দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিতে,—তাহা কখনই ঘটিতে দিব না। এই

হরিতারণের প্রতাপে হুগলী সহরটা কাঁপিয়া উঠে,—ও-ছিনে-জোঁকটা'ত কোন্ ছার? আমি হুগলীতে একশত খুন করিয়া হজম করিতে পারি!—আমার কে কি করিবে? আমার ভয় কা'কে? আমি মনে করিলে আজই কালেক্টরি লুটাইতে পারি,—অথচ আমার বিরুদ্ধে একটীও সাক্ষী মিলে না! আমি মনে করিলে, এই দণ্ডে কালাচাঁদকে কাটিয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া, তিল-তিল করিয়া, গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিতে পারি—অথচ, আমার কেহই কিছুই করিতে পারে না। কেলে-ছোঁড়াটাকে আমার ভয় কি? ওটা'ত শিশু,—বালক,—গলা টিপিলে দুধ বার হয়,—তেঁতুল-তলা দিয়ে গেলে ওর গলায় দই বসে,—ওকে আমার ভয়ই বা কি?—ভাবনাই বা কি? ওর আছে কি যে, ওর জন্য আমাকে চিন্তিত হ'তে হবে? কেলে-ভূতোটার বিষয় নাই, জমী নাই, টাকা নাই, বাড়ী নাই, ভীটা নাই, উনুন নাই,—আজ-খায়, এমন সংস্থান নাই;—কিছুই নাই,—তবে ও-ছোঁড়াটা আমার সঙ্গে সমান

টক্কর দিবে কিসে? জেল-খাটা, ঘানি-টানা, কয়েদ-খালাসি, বদমাইস ফাঁসুড়ে, চোর—ওর আবার হুগলী-সহরে সহায়-সম্পত্তি কে হবে? কার্ হিম্মতে, কার্ হেমাকতে, ও-গাঁটকাটা-টা আমার সঙ্গে মোকদ্দমা লড়্বে? এমন কে আছে,—কার্ ঘাড়ে এমন তুটা মাথা আছে যে, সে ব্যক্তি কালাচাঁদকে পশ্চাতে করিয়া বিবাদার্থ আমার সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইবে? অথবা এমনই বা কে আছে যে, সে ব্যক্তি কালাচাঁদকে সম্মুখে রাখিয়া, পশ্চাৎ হইতে আমার সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইবে? সে কি জানে না, আমি নবাব-বাবুকে জেল খাটাইয়াছি,—প্রাণকৃষ্ণ হালদারকে দ্বীপান্তর পাঠাইয়াছি,—নির্দ্দোষ হরচন্দ্রকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলাইয়াছি?—সে কি জানে না, আমি রাণী বিন্দুবাসিনীকে পথের ভিখারিণী করিয়াছি,—জমীদার জয়কালী মুখুয্যের ভিটায় ঘু-ঘু চরাইয়াছি,—মুচ্ছুদ্দি যাদবদত্তের মাথা প্রকাশ্য রাজপথে দ্বিখণ্ডিত করাইয়াছি? এত জানিয়া-শুনিয়া, কে আমার সঙ্গে

সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে? তবে কালাচাঁদকে আমার ভয় কি? ও-ছোঁড়া আমার কি করিতে পারে? ও দুগ্ধপোষ্য বালকটা আমার কাছে কোথায় লাগে? আজই ত আমি ওকে মিছামিছি চোর বলিয়া হাতে হাতকড়ি দেওয়াইতে পারি!—ছয়মাস কারাগারে রাখাইতে পারি! দারোগা করিম সেখত আমার গোলাম,—গোলামের গোলাম!—তাকে যা বলিব, তাই সে করিবে! দারোগা, দু-বেলা বাসায় এসে যোড়হাত ক'রে দূরে দাঁড়াইয়া থাকে—সে, আমার কথায় কি না করিতে পারে? খবর দিলে, দারোগা আজই রাত্রে কেলেটাকে ধ'রে, বেঁধে নিয়ে যেতে পারে! ওদিকে ডেপুটী বকাউল্লা,—সে'ত পরম-বন্ধু। একবার তাঁকে চোখের ইঙ্গিত করলে, কেলেটার এক মুহূর্ত্তেই ছয়মাস জেল হয়ে যাবে! আমি পারি না কি? তবে কালাচাঁদকে ভয় কি?

ভয় কিছুই নাই! তবু মন কেমন ধুক্-ধুক্ করে! কেন এমন হয়? কেন এক একবার

বুকের ভিতর গুর্‌-গুর্‌ করিয়া উঠে! যাহা ভাবি, যাহা স্থির করি,—কেন তার উল্টা উৎপত্তি হয়? যাহাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিব,—এরূপ সঙ্কল্প ছিল, সে, কেমন করিয়া এরূপ বৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় বাড়িয়া উঠিল? যাহার বিলোপ-সাধন জন্য, আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিয়াছি, সে-ই এখন বড় হইয়া, প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ধরিয়া, আমাকে মাছ-দই-সন্দেস ভেট দেয়, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, ভক্তিভরে দাদা বলিয়া ডাকে! তবে কি এই হরিতারণ দত্তের ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে?—শক্তির লাঘব হইয়াছে? তেজস্বিতার খর্ব্ব হইয়াছে? হরিতারণ দত্তের ঈষৎ দৃষ্টি নিক্ষেপে, সামান্য অঙ্গুলি-হেলনে দিক্‌ সমভূম হয়, কিন্তু আমার এই পঁচিশ বৎসরের তীব্র-কুটিল-কটাক্ষে, বিষম বাহ্বাস্ফোটেও—এই পিতৃমাতৃহীন নেংটী-ইন্দুর কালাচাঁদ, বিশাল শাল-দ্রুমবৎ বিপরীতরূপে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিল! ওঃ!—কেন এমন হয়?

ওঃ—ওঃ! কি নিদারুণ বিভীষিকা! প্রথম হইতে

আজ পর্য্যন্ত সকল কথা ভাবিতে গেলে, দেহে আর প্রাণ থাকে না। কালাচাঁদের আপন ঠাকুরদাদা কাটা পড়িল, কালাচাঁদের বাপও জ্বররোগে মরিল,—আমি ভাবিলাম, আপদ গেল, কণ্টক দূর হইল,—নহিলে জ্ঞাতিশত্রুদ্বারা চিরদিন হাড়ে-নাড়ে জ্বলিতাম! বেশ নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন শুনিলাম, কালাচাঁদের মা পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। শুনিয়াই মাথাটা কেমন ঘুরিয়া উঠিল। প্রথম ভাবিলাম, এ-কথা কখন সম্ভব হইতে পারে না। কালাচাঁদের পিতার তিন মাস হইল মৃত্যু হইয়াছে;—সুতরাং তাহার স্ত্রীর গর্ভ হইবে কিরূপে? ক্রমশ শুনিলাম, গর্ভ প্রকৃতই বটে! মনটা বড়ই খারাপ হইল! ভাবিলাম, স্ত্রীলোকটাকে ভ্রষ্টা বলিয়া তাড়াইয়া দিই না কেন? মনে হইল, এ কাজে তত সুবিধা হইবে না;—বরং গোলযোগ ঘটিলেও ঘটিতে পারে। বিশেষ গিন্নী (আমার স্ত্রী) উহাকে সতী-লক্ষ্মী বলিয়া থাকেন। তার পর ঠিক হইল,—গর্ভস্রাব

করাইয়া দিলে ক্ষতি কি? চেষ্টাও হইল,—হতভাগী ঔষধও খাইল;—কিন্তু কিছুই ফল হইল না। গর্ভ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রকৃতই আমার ভয় হইল। আমি তখন কৌশলে যোগাড়যন্ত্র করিয়া হতভাগীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। ভাবিলাম, বর্ষাকাল, শ্রাবণমাস, নদ-নদী খাল-বিল পূর্ণ,—পথসমূহ কর্দ্দমক্লিষ্ট এবং পিচ্ছল,—এ-সময় ঝড়বৃষ্টি-বজ্রাঘাতেরইবা অভাব কি? ডুলি করিয়া গেলেও, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের এ-সময় নিশ্চয় প্রাণ-সঙ্কট হইবে! একটী খুব খারাপ দিন দেখাইয়া, অশ্লেষা, দিক্‌শূল, পাপযোগ দেখিয়া, বারবেলায় হতভাগীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু ইহাতেও কিছুই হইল না। অবশেষে মনকে দৃঢ় করিলাম,—বেটা হবে, কি মেয়ে হবে,—তার ঠিক নাই!—আমি এখন এত মিছা ভাবিয়া মরি কেন? বিশেষ, জন্মিয়াই অনেক শিশু প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। আরও এক কথা,—গর্ভবতী স্ত্রীলোককে নদীপার হইতে নাই;—হতভাগী নয়মাস গর্ভে

সাতটা নদী খাল পার হইয়াছে। অতএব, পুত্রই হউক, আর কন্যাই হউক,—ছেলেটী কিছুতেই বাঁচিবে না,—কিছুতেই তিনদিন পার হইবে না।

এইরূপ আশ্বাসে বসিয়া আছি, এমন সময় একদিন সংবাদ পাইলাম, হতভাগীর একটী পুত্র-সন্তান হইয়াছে। বুকটা অমনি ধসিয়া গেল। কি করি—উপায়ত নাই!—তিনদিন কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিলাম না। জন্মক্ষণ জানিয়া পাঁজি খুলিয়া দেখিলাম,—শনিবার অমাবস্যায় ছেলেটা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। মনে অল্প আহ্লাদ হইল। অমাবস্যার ক্ষণে জন্মিয়াছে,—তাহাতে আবার শনি-বার পাইয়াছে,—সুতরাং এ ছেলে কিছুতেই বাঁচিবে না। একজন আচার্য্যকে ডাকাইলাম। কথা-প্রসঙ্গে কৌশলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অমাবস্যার রাত্রি, শনিবারে কোন ছেলে জন্মিলে, সে ছেলেটা বাঁচে কিনা? আচার্য্য পুঁথি খুলিয়া, শ্লোক আওড়াইয়া,—বলিলেন, 'যখন ভাদ্রমাস, শনি-বার, অমাবস্যা এবং রাত্রিকাল,—মঙ্গলের দশা,

রাক্ষসগণ,—তখন সে-ছেলে কিছুতেই বাঁচিবে না। এই দেওয়ালে লিখে রাখুন,—এক বৎসর মধ্যে সে-ছেলের মরণ নিশ্চয়।' মনটা তবু কতক আশ্বস্ত হইল।

এক বৎসর উত্তীর্ণ হইল, তবু কালাচাঁদ মরিল না। চর পাঠাইয়া সংবাদ লইলাম,—সে আসিয়া বলিল, ছেলেটা কালো কিট্‌কিটে হইয়াছে,—ঠিক্ যেন ধান্‌সিজে-হাঁড়ির তলা। সেটা মামার বাড়ীতে ভাল খেতে-মাখ্‌তে পায় না। লোকের ছাঁচ-তলায়, আঁস্তাকুড়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। কাহাকেও কিছু খাইতে দেখিলে, সে তাহার মুখটী-পানে চাহিয়া থাকে। তার মামারা গরীব,—কোথা কি পাবে? শুনিলাম, দুধের বদলে কেলেটাকে ফেন খেতে দেয়! কেলেটার চেহারা দেখিলে মনে হয় ঠিক্ যেন, সেওড়া-গাছের ভুত।

এ কথা শুনিয়া তবু মনটা একটু ঠাণ্ডা হইল। ভাবিলাম, ছোঁড়াটা মামার বাড়ী না খেতে পেয়েই মরিয়া যাইবে। পাঁচ সাত বৎসর এই ভাবেই

কাটিল,—আমিও তাহার মরণ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

কিন্তু দুঃখ এই, অদৃষ্টের ফের-ঘোর এমনি যে, কালাচাঁদ মরিল না। পরম্পরায় শুনিলাম, কালাচাঁদ বেশ মোটাসোটা হইয়াছে,—বর্দ্ধমানে রাজার স্কুলে পড়িতেছে,—এবং দিব্যসুখে আছে। একথা শুনিয়াইত আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তখন রাগ করিয়া লাভ কি? ভাবিলাম, একবার কালাচাঁদকে বর্দ্ধমান থেকে আনাই না কেন?—দেখি না কেন,—কেমন হইয়াছে! লোকের কথা সত্য কি মিথ্যা, একবার স্বচক্ষে দেখিয়া সে বিষয় পরীক্ষা করিয়া লই না কেন? বর্দ্ধমানে তার মামাকে চিঠি লিখিয়া কালাচাঁদকে আনাইলাম,—তাহার মূর্ত্তি যাহা দেখিলাম, তাহা বড় আশাপ্রদ নহে,—ঠিক্ যেন গুলি-বাঘ! বড় বড় চঞ্চল চোখ দুটা যেন চর্‌কি ঘুরিতেছে! নাকে-মুখে-চোখে যেন কথার ফোয়ারা উঠিতেছে! খায় রাক্ষসের মত। সেই ছেলে-বয়সেই একদমে

ছয়গণ্ডা লুচি খেয়ে ফেলিল। পাড়ার ছেলে-গুলাকেত মেরে-ধরে, কাম্‌ড়ে-কুম্‌ড়ে পাড়াছাড়া করিল। বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে, ঠিক্ যেন ডাকাত-পড়া-গোছ প'ড়ে, মা-দুর্গার মুকুটখানি ছিঁড়িয়া লইয়া পলাইল। অবশেষে কালাচাঁদ কিনা, বাছা সুরেশের গালে এক চড় মারিল। বাছা সুরেশ অমনি ঘুরিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইল। আমার তখন ইচ্ছা হইল, কেলেটাকে দু-আধখানা করে কেটে মাটীর নীচে পুঁতে ফেলি! কিন্তু চারিদিক্ দেখিয়া, পাঁচ সাত ভাবিয়া'ত কাজ করিতে হয়! আমি মনে করিলাম, কালাচাঁদকে যদি এখন আমি কিছু বলি, তবে গ্রামের সকল-লোক আমাকে দোষ দিবে। বলিবে,—ও-ছেলেটীর মা-বাপ নাই বলে কি, ওর বুড়ো ঠাকুরদাদার ওকে অমন করে মারা উচিত হয়েছে? এইরূপ আমি সাত-পাঁচ নানা-খানা ভাবিয়া, কালাচাঁদকে তার পর দিনই মামার বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। এখন মনে হইতেছে—সে কাজটা আমারই চুক হইয়াছিল,—শীকার হাতে

পাইয়াছিলাম,—ছাড়িলাম কেন? দু-দশদিন পরে তখনই একটা এস্পার ওস্পার করিলেই ভাল হইত!—কালাচাঁদের মামাকে না হয় একটা চিঠি লিখিতাম,—"হঠাৎ সর্পদংশনে কালাচাঁদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সকলি ৺মরজি! বাছার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি অন্ধ হইয়াছি।"—কিন্তু তখন সে বুদ্ধি আমার ঘটে আসিল কৈ? আর আমিই বা তখন কেমন করিয়া বুঝিব যে, কালাচাঁদ ক্রমশ এমন দারুণ দিগ্বিজয়ী হইয়া উঠিবে? সে সময় একদায়ে কিন্তু গুরু রক্ষা করিয়াছিলেন। গিন্নী তখন কাশী গিয়াছিলেন। আজিকার যে রকম ভাবগতিক দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয়, গিন্নী যদি সে সময় বাটীতে থাকিতেন, তাহা হইলে কালাচাঁদকে লইয়া কাঁধে করিয়া নাচিতেন,—হয়ত বলিতেন, কালাচাঁদ এইখানেই থাকৃবে, আর তার মামার বাড়ী যাওয়া হবে না। আমার পূর্ব্বজন্মের অনেক পুণ্যবল ছিল, তাই গিন্নী তখন বাটীতে থাকেন নাই। সে যাহা হউক, এখন

গতকর্ম্মের অনুশোচনা করা বৃথা। উপস্থিত কিসে রক্ষা হয়, তাহা ভাবাই ভাল।

আচ্ছা,—তেমনটা কেন হইল?—সবইত ঠিক্ হইয়াছিল, চারে মাছ আসিয়াছিল,—টোপ গিলিয়াছিল,—তবে এমন ফস্‌কাইল কেন? কালাচাঁদের মামাকে ৭০১৲ টাকা নগদ গণিয়া দিলাম,—হৃষ্টচিত্তে সে টাকা লইল। একরাত্রি বাটীর ভিতর টাকা রাখিল। নগদ কর্‌করে টাকার উপর অবশ্যই তাহার মায়া জন্মিল,—সে বোকা প্রাতে হঠাৎ টাকাগুলা ফেরত দিল কেন? টাকা সিন্দুকজাত হইবার পর সে টাকা কি কেহ ফেরত দিতে পারে? বিশেষত, কালাচাঁদের ঘর-ভিটা পুকুর-বাগান বিক্রয় হইয়া গেলে, তার মামার কি ক্ষতি ছিল? ক্ষতি ত কিছুই দেখি না,—কিন্তু তথাচ মামা টাকা ফেরত দিল কেন? আমি যে কৌশল-জাল পাতিয়াছিলাম, তাহা কি বুঝিতে পারিয়া, মামা আমাকে ফিরাইয়া দিল? সে তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? তাহাকে আমার সম্পত্তির

কার্য্য-নির্ব্বাহক নিযুক্ত করিব বলিয়াছিলাম,—এক-শত টাকা মাসিক বেতনেরও কথা আভাস দিয়াছিলাম,—কৌশলে খসড়া-উইলনামাও দেখাইয়াছিলাম,—দেখিয়া-শুনিয়া, সকল কথাইত সে বিশ্বাস করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়! বিশ্বাস যদি না করিবে, তবে সে টাকা লইবে কেন? রাত্রে কি তার বুদ্ধি বাড়িল? রাত্রিকালে শুইয়া-শুইয়া, ভাবিয়া-ভাবিয়া, সে, কি বুঝিতে পারিল যে, আমার সবটাই ফাঁকি,—ষোলকড়াই কাণা? বর্দ্ধমানে কোন বন্ধুর বাটীতে আমি সেই দরোয়ানটীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; দ্বারবানকে লুক্কায়িত করিবার কথা রাত্রে কি কোনরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল? প্রকাশ পাইবারত কোন সম্ভাবনা দেখি না। আর প্রকাশ পাইলেই বা আমার মনোগত অভি-সন্ধি কিছুতেইত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কালাচাঁদের ঘরভিটা এবং উইল,—দুইটা এক-সঙ্গে রেজষ্টরি করিব,—ইহাই মামাকে প্রস্তাব করা আমার স্থির ছিল। যদি ঘরভিটা কোন গতিকে

রেজষ্টরি না ঘটে, তাহা হইলে তখনই পলাইবার উপায় বিধান জন্য খানসামা দ্বারা দ্বারবানকে ডাকাইয়া বলাইব,—"আপনি শীঘ্র বাটী চলুন,—সুরেশের ব্যারাম"—ইহাও স্থির ছিল! কিন্তু এই মানসিক গূঢ় সঙ্কল্পের বিষয় প্রকাশ হইবার কোনও উপায় ছিল কি? দ্বারবানত অবিশ্বাসী নহে! খানসামাত প্রভুভক্ত;—তবে কালাচাঁদের মামা কেমন করিয়া টের পাইবে, আমার সকলি ভুয়া-বাজী!—উইল-রেজষ্টরী মিথ্যা—ফাঁকি দিয়া কালা-চাঁদের ঘরভিটা লওয়াই কেবল সত্য!!

তবে কি করুণাময়ী, মামাকে ভাঙ্গাইল? সে নচ্ছার ছুঁচোবেটী ভাঙ্গচালি দিবার কে? কালা-চাঁদের ভিটা আমি টাকা দিয়া কিনিব,—তাতে বাধা দিবার জন্য তো-বেটীর মাথাব্যথা পড়ে কেন? কালাচাঁদ তোর কে হয়? তোর কি? সে-দিন অদৃষ্টে কতই না কর্ম্মভোগ ছিল! সেই পাড়া-মজানি বেশ্যাটাকে জানেলার কাছে আনিয়া দুটা মিষ্ট কথায় বুঝাইবার জন্য কতইনা আমাকে

টাকার ঝন্‌ঝনানি শব্দ করিতে হইয়াছিল? শুনিয়াছিলাম, ও-বেটী কালাচাঁদ-গত প্রাণ হইয়াছিল,—তাই তাহারও তোষামোদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম! কিন্তু কি আপ্‌শোষ! মাছ গাঁথিয়া খেলাইবার সময় ডোর ছিড়িয়া গেল! ও-বেটী যেমন আমার মনে সে-দিন কষ্ট দিয়াছিল, তেমনি সে, শেষে নিজে কষ্ট পাইল! দিনকতক পরে উপপতিটা মরিল,—কালাচাঁদ পলাইল, শেষে নিজে না খেতে পেয়ে, ঘরে মরে, তিনদিন বাসিমড়া হয়ে, ঘরের ভিতর পচিল। আমাকে কষ্ট দিয়ে কেহই সুখে থাক্‌তে পারে না! যে আমাকে কষ্ট দিবে,—একটা না-একটা তার বিভ্রাট ঘটিবেই।

সত্য সত্যই কি করুণার জন্য সেই মহা-উদ্দেশ্য সফল হইল না?—তাই কি?—কেমন করিয়া নিশ্চয় বলিব?

অথবা বুঝি আমার দুরদৃষ্ট এবং কালাচাঁদের শুভাদৃষ্ট-নিবন্ধনই এ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে!! তেমন কৌশলময় সূক্ষ্ম পাকা ওস্তাদি জালে মাছ

পড়িয়া ছিঁড়িয়া পলাইল,—তখন অবশ্যই কালাচাঁদের ভাগ্যবল বলিতে হইবে!

আচ্ছা,—সব কথাই ছাড়িয়া দিলাম। কালাচাঁদের অদৃষ্ট না হয় খুব ভাল বলিয়াই মানিয়া লইলাম, তথাচ তাহারত তিনবৎসর জেল হইল,—ঘানিগাছে ঘুরপাক দিতে হইল। কালাচাঁদকে কারাগারে পাঠাইবার প্রধান উদ্যোগকারী কে? আমি গোপনে তদ্বির না করিলে, কালাচাঁদ নিশ্চয়ই খালাস পাইত। সে যেরূপ কৌশল-জাল পাতিয়া জজের মন ভুলাইয়াছিল, তাহাতে জুরিগণও একবাক্যে 'কালাচাঁদ নির্দ্দোষ' এই কথা বলিত। সৌভাগ্যক্রমে জুরি আমার বশে ছিল,—তাই যা'হোক তিনবৎসর মিয়াদ হইল,—নচেৎ জজকে হস্তগত করিতে পারিলে, নিশ্চয় তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইত। অভিযোগ অতীব গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কেলে-ছোঁড়াটা জেলে গেল,—আমি ভাবিলাম, ছোঁড়া এইবার নিশ্চয় মারা পড়িবে। জেলের

ঘানি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাছার বত্রিশ-নাড়ী পাক পাইবে। শেষে চি-চি ডাক ছাড়িয়া বাছাধনকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; ইহাই আমার ধ্রুব ধারণা ছিল। এমন কি, আমি একবৎসর পরে নাএব-দারোগাকে পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, “কালাচাঁদের যদি কোন ভালমন্দ ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ যেন আমি সংবাদ পাই।” নাএব-দারোগা বড়ই বোকা। সে সপ্তাহে সপ্তাহে আসিয়া সংবাদ দিত, “আপনার কালাচাঁদ বেশ আছেন,—কোন কষ্ট নাই।” আরে আহাম্মক। আমি কি কালাচাঁদের শুভ-সংবাদ খুঁজিতেছি? আমি যে, কালাচাঁদের মৃত্যুসংবাদ পাইবার কেবল কামনা করিতেছি !! যাহা হোক, সেই দারুণ গাধা দারোগাটাকে দেখিলেই আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত! কিন্তু কি করি? “কালাচাঁদ আছেন ভাল”—তাহার মুখে এ কথা শুনিয়া আমাকে অগত্যা প্রতি সপ্তাহেই একবার কাষ্ঠ হাসি হাসিতে হইত!

উঃ! হিসাবের এত তফাৎ হয় কেন? কারাগারে কালাচাঁদের নিশ্চয়-মৃত্যু ভাবিয়া ঠিক এই সময়েই আমি তাহার ভিটাটুকু দখল করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে এখন প্রকাণ্ড ত্রিতল ইমারত! কালাচাঁদ এখন যদি তাহার ঘরভিটা চায়,—তবে তাহা কেমন করিয়া দিব?—গলাধাক্কা দিয়া দূর করিয়া তাড়াইয়া দিব,—বলিব, "কোথা তোর ভিটে, তা কে জানে?" যদি বেশী বাড়াবাড়ী করে,—বলিব, 'তামাদি হইয়াছে,—আর নালিস চলে না।' শেষে ত কালাচাঁদকে অবশ্যই ঐ কথা বলিব,—কিন্তু আমার এরূপ হিসাব ভুল হইল কেন? ভিটাটুকু এতদিন ফেলিয়া রাখিলাম,—আর চারিদিক না দেখিয়া কারাবাসকালে কেনই বা লইলাম?

কালাচাঁদ কারাগার হইতে বাহির হইল,—শুনিলাম, খুব হৃষ্টপুষ্ট যুবাপুরুষ হইয়া আসিয়াছে। জেলখানা,—যমের দক্ষিণদ্বার স্বরূপ। কেলে-ছোঁড়াটা কিনা সেখান থেকে ফিরিয়া আসিল!—

শুধু ফিরিয়া আসিল,—মোটা হইয়া ফিরিল! লোকমুখে এসব কথা শুনিয়াইত আমার চক্ষুস্থির।

ক্রমশ পরম্পরায় আরও শুনিলাম, কালাচাঁদ জেলখানা হইতে অনেক টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছে। সহসা সে কথা বিশ্বাস হইল না। তারপর এমন কথাও কর্ণগোচর হইল,—কালাচাঁদ দানধ্যান আরম্ভ করিয়াছে। গরীব দুঃখীকে দেখিলে সিকি আধুলি দেয়, কাপড় কিনিয়া দেয়। এসব কথা শুনিয়া আমার আর রাত্রে ঘুম হয় না। কেবলই তখন মনে হইতে লাগিল, "কেলেটা কল্লে কি!" পতে নাপ্‌তেটারই বা কি আক্কেল?—কি রকম হেমাকৎ? এ হুগলী সহরে কালাচাঁদকে বাসা দিবার জন্য তোকে কে সেধে-ছিল? ইচ্ছা হয়, পতেটাকে জুতিয়ে আটাপেটা করি। তা, জুতো খেলেওত পতের লজ্জা নেই। ঐ পতেটাই কালাচাঁদকে সঙ্গে করে আমার বাসায় এসেছিলো। আমি তখন কালাচাঁদের চেহারা

দেখিয়াই চটিয়া গেলাম! তুই কেলে ছোঁড়া।—তোর মা নেই, বাপ নেই,—লোকের পাত কুড়িয়ে খেয়ে, তুই মানুষ,—তুই এমন মোটা-সোটা 'গাড়ুর-গুপ্‌সো' হ'তে গেলি কেন? যেমন মানুষ, তেম্‌নি থাক্‌! তোকে সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করিতে এখানে কে আসিতে বলিয়াছিল? তুই আমার চোখের সাম্‌নে আস্‌বার কে? বেরো হত-ভাগা, বেরো আমার বাড়ী থেকে!! সে-দিন এমনি রাগই হয়েছিল। দেখিয়াই যাকে বিরক্তি বোধ হয়, তার সঙ্গে আর কথা কহিব কি? কেলেটার সঙ্গে সে-দিন বিশেষ কোন বাক্যালাপও করিলাম্‌ না,—দুই-এক কথা কহিয়া মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া রহিলাম।

বাক্যালাপ করিলাম না বটে, কিন্তু মনটা সেই দিন হইতেই দমিয়া গেল। প্রথম চিন্তা হইল,—পতে নাপ্‌তেটাকে এ-দেশ থেকে তাড়াইবার উপায় কি? বৃক্ষে পাখী বাসা করিয়াছে,—বৃক্ষটীর মূলচ্ছেদ করিলেই পাখীটী পলাইবে! পতেটার ঠ্যাং খোঁড়া

করিয়া দিলে হয় না ? পতেটা ডুলি করিয়া দেশে গিয়া ভুগুক,—আর কালাচাঁদও একদিক্ দিয়া পলাইয়া যাক্ ! না,—প'তের বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুটিয়া আনিব ? অথবা তাহার ঘর জ্বালাইয়া দিব ? গৃহদগ্ধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা ! প'তের দুখানি ঘরই পুড়িয়া ছাই হইবে,—কালাচাঁদও স্থানাভাবে অন্যদেশে যাইতে বাধ্য হইবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, গৃহদগ্ধের উদ্যোগ আদি করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম,—কালাচাঁদের পয়সা কমিয়াছে, মুদীর দোকানে ধার হইয়াছে, পতিতেরও সহিত তাহার মাঝে মাঝে একটু আধটু ঝগড়া-বচসা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কৌশলে পতিতকে ডাকাইলাম। মিষ্ট কথায় নাপিতকে ভুলাইলাম। পতিতকে বাটীর ক্ষৌরকার নিযুক্ত করিলাম। চৈত্রমাসে চড়কের দিন পতিতকে দুইটী টাকা সন্দেস খাইতে দিলাম। পতিত আমার গোলাম হইল। নাকবেঁধা পশুর মত পতিতকে তখন যা বলি, তাই সে করে।

কৌশলে পতিতের নিকট প্রস্তাব করিলাম,—"তোমার বাসা হইতে কালাচাঁদকে শীঘ্র তাড়াইয়া দূর করিতে হইবে।" তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, "কালাচাঁদ চোর, ডাকাইত, ফাঁস্থড়ে। কালাচাঁদ লোকের গলায় ছুরি দিতে পারে। হয় ত তোমাকে একদিন খুন ক'রে, তোমার বাক্স ভেঙ্গে কালা-চাঁদ চলে যেতে পারে! দেখ্‌চো না উহার চেহারা? ঠিক যেন যমদূত! ও লোকটা কত গৃহস্থের যে সর্ব্বনাশ করেছে, সে কথা তোমাকে কি আর বল্‌বো! পাকা ডাকাত না হ'লে, কি আর ও জেল খাটে?"

পতিত আমার কথার উত্তর দিল, "আজ্ঞে, আপ্‌নি যা ব'লচেন,—সবই ঠিক কথা। আমি এত দিন ঠাওরাইতে পারি নাই। এখন আমাকে যা আজ্ঞা করবেন, তাই করবো।—পতিতত আপনা-ছাড়া নয়।"

আমি। কালাচাঁদের এখন চলে কিসে?

পতিত। মাথামুণ্ড চল্‌বে আর কিসে?

দু-পাঁচ টাকা জেল থেকে চুরি করে এনেছিলো, তাই দিন কতক একে ॥০ আনা, ওকে ১৲ টাকা দিয়ে বাবুগিরি করা হলো। আমি তখন তাকে ঢের নিষেধ কর্‌লাম,—তা, তখন টাকার গরমে সে, আমার কথা শুন্‌বে কেন? পতিতের কথা বাসী হ'লেই মিষ্টি লাগে! পতিত যা বলে-ছিলো, শেষে তাই এসে ঘট্‌লো! আমি মর্‌বো কবে, তা'ই বল্‌তে পারি না,—নচেৎ আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে পতিত কি না জানে? আর-বছর ছিষ্টিধর ঘোষকে বলে এলেম, তোমার বিষয় থাক্‌বে না,—আর এ বছর সেই বিষয় অষ্টমে চড়্‌লো!

আমি। এখন কালাচাঁদের তবে কি হচ্চে?

পতিত। এই হরে মুদীর উঠ্‌নোর দেনা আঠার টাকা হয়েছে,—পর্‌শু আমি তাকে টীপে দিয়ে এলাম, নগদ পয়সা ভিন্ন তুমি পাই-পয়সার জিনিস কালাচাঁদকে দিও না। শেষে যে তুমি পতিতকে দূষবে, তা কখন হ'তে পারে না।

পতিত কারু কখন সিকি পয়সা ধার করে না। পতিতই বরং লোককে ধার দেয়।

আমি। দোকানদার কি কালকুটেটারে উঠ্‌নো আর যোগাইল?

পতিত। আজ্ঞে, না,—উঠ্‌নো আসিল না দেখিয়া, কালাচাঁদ এদিক-ওদিক চারিদিক চাইতে লাগ্‌লো—চাল নাই, ডাল নাই, নুন নাই, তেল নাই, হাঁড়ীটেও ফাটা,—তা, চারিদিক্-পানে চাইলে ত হাঁড়ী-কাঠ-নুন-তেল-চাল-ডাল আইসে না!—আমি কালাচাঁদের গতিক দেখিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলাম! আমার ভয় হইল, পাছে কালাচাঁদ আমার নিকট হইতে পয়সা ধার চায়। কর্ত্তা-মোশাই! আপনিই বলুন, আমি কালাচাঁদকে কত আর ধার দিব? দিন নাই, রাত নাই, সময় নাই, অসময় নাই,—সদাই তার পেটের ভাতের জন্য পয়সা চাওয়া। আমি একলা পতিত কত দিক্ সাম্‌লাবো বলুন? প্রত্যহ আমাকে ৺ লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য একটী পয়সা রাখ্‌তে হয়,—ভাল

বামুন দেখিয়া প্রত্যহ আমি একটী করিয়া পয়সা দান করি,—কাণা-খোঁড়াকে দিতে প্রত্যহ গড়ে দুইটী করিয়া পয়সা যায়,—তা, আমি গরীব-মানুষ, আর কোথা কি পাবো?—কালাচাঁদকে খাওয়াতে নিত্যি নিত্যি পয়সা কোথা পাবো?

আমি। তবে কি গত পরশ্ব কালাচাঁদ খাইতে পায় নাই?

পতিত। কর্ত্তা-মোশাই! কালাচাঁদের কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে এসে শুন্‌লাম,—কালাচাঁদ পথে তিনটী পয়সা কুড়াইয়া পাইয়াছে। তাহাতেই মালসা কিনেচে, চাল্ কিনেচে,—কার্ বাগান থেকে চুরি করে কাঠ ভেঙ্গে এনেচে,—এই সব যোগাড় করে ভাত ফুটিয়ে গণ্ডে-পিণ্ডে খেয়েচে। সে খাওয়ার চোট্ কি মোশাই! তিনটী পয়সার মধ্যে দুইটী পয়সা,—ঐ খাওয়ার খরচ,—আর এক পয়সায় অম্বুরী তামাক কিনেচে। আমি বাসায় ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তে, কালাচাঁদ হেসে হেসে আমাকে

ডাক্‌লে, "এসো এসো বন্ধু এসো!—একবার অম্বুরী তামাকটা খেয়ে যাও!" আমি এ-কথা শুনে ভয়ে আর বাঁচি না। ভাব্‌লাম,—বিষ খাইয়ে আমাকে মার্‌বে নাকি? কি করি, ঘরে যখন কালসাপ পুষেচি, তখন চারা কি আছে? কর্ত্তা মোশাই! আমাকে আর যা বলুন, সব কর্‌তে পারি,—বাঘের মুখে আমি ঢুক্‌তে পারি, কিন্তু অমন গোঁয়ার-গোবিন্দ লোকের কাছে আমি ঘেঁস্‌তে পারি না। কি জানি, পাছে যদি সে একটা চড়িয়ে দেয়, তা'হলে ত একবারেই গেছি! তার আঙ্গুল নয় ত ঠিক যেন আছোলা বাকারি! তখন ছিমধুসুদনের নাম স্মোরণ করিতে করিতে আমি কালাচাঁদের কাছে যেয়ে উপস্থিত হ'লাম। আমাকে দেখেই তার অমনি খিল খিল হাসি আরম্ভ হলো।

আমি। আচ্ছা। সে কথা যা'ক্। হরে মুদীকে এখনি তুমি আমার নাম করে ডেকে নিয়ে এসো। আজই ছোট আদালতে কালাচাঁদের নামে

নালিষ দায়ের করে দাও। নালিষের নাম শুন্‌লেই কেলেটা ভয়ে পালিয়ে যাবে। আর তুমিও গিয়ে বল্‌বে,—"কালাচাঁদ! আমার বাড়ী থেকে তুমি এখনি চলিয়া যাও!"—

হায়! এইরূপ কত উদ্যোগ-সংযোগ করিলাম, কত কৌশলে কেমন পাকা ফাঁদ পাতিলাম,—কিন্তু আজ সবই ব্যর্থ হইয়া গেল! গত কল্য হরে মুদীকে দিয়া ছোট আদালতে কালাচাঁদের নামে নালিষ করাইলাম, পতিতকে দিয়া তাহার বাসা হইতে তাড়াইলাম,—কিন্তু অহো! আজ কিনা সেই কালাচাঁদ মাছ হাতে করিয়া, দই-সন্দেস-তরকারি ভেট লইয়া আসিয়া, আমাকে দাদা বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল!!

আমি যতই তার বুকে পাথর চাপান্ দিতে চাই, ততই সে ফুলিয়া উঠে। যতই তাহাকে হ্রস্ব করিবার যত্ন করি, ততই সে দীর্ঘ হইয়া দাঁড়ায়। আমি যতই তাহার মৃত্যু কামনা করি, ততই সে যেন অমর বর পাইয়া, ধেই-ধেই রবে

আমার সম্মুখে বিকট নৃত্য করিতে থাকে। জানি না, ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে কি লেখা আছে! আমি বুঝি মজিলাম! ডুবিলাম! মরিলাম!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অদ্য প্রাতে যখন মাছ হাতে করিয়া কালাচাঁদ আমাকে "অ, দাদা-মোশাই!" বলিয়া ডাকিল, তখনি তার মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিলাম, একি?—একি?—যেন এক বিষম বিভীষিকা দেখিয়া উঠিলাম! একি ভূত, প্রেত, যক্ষ, না যমদূত? কল্য যাহার একটী মাত্রও পয়সা সংস্থান ছিল না, কল্য যাহাকে অভুক্ত অবস্থায় বিতাড়িত করিয়াছি, কল্য যাহার ছিন্ন মলিন বসন ভিন্ন সম্বল ছিল না,—সে আজ কেমন করিয়া নববস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক, হাসি-হাসি মুখে, মাছ-দই-সন্দেস ভেট লইয়া আমাকে দাদা বলিয়া ডাকে? এ ব্যাপার দেখিয়াইত দেহে আর আমার প্রাণ রহিল না! প্রথম মনে হইল, এই লোকটা কি কোন বহুরূপী?—কালাচাঁদের মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছে

কি? তখনি আবার মনে হইল,—ইহা কিছুই নহে,—আমি বুঝি কেবল আতঙ্ক-যুক্ত স্বপ্ন দেখিতেছি! শেষে দেখিতে দেখিতে স্থির বুঝিলাম, ইহা বহুরূপীও নহে, স্বপ্নও নহে,—ইহা সত্য-সত্যই কালাচাঁদ! তখন যদি আমার সম্মুখে বজ্রাঘাত হইত, অথবা মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত, তাহা হইলে আমি তত আশ্চর্য্যান্বিত বা কাতর-যুক্ত হইতাম না।

কিন্তু কি করি? উপায়ত কিছুই নাই!—চারিদিক চাহিয়া, আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার ভাবনা হইল, কালাচাঁদ বুঝি ভিটার ভাগ চাহিতে আসিয়াছে! বুঝি আমার ত্রিতল দালানের ইঁট এক একখানি করিয়া, খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, কালাচাঁদ দড়ি ধরিয়া ভিটার ভাগ লইতে উদ্যোগী হইয়াছে।

আমার মনে হইল, কালাচাঁদের পশ্চাতে অলক্ষ্যে শত শত লোক আছে। কালাচাঁদ একা নহে,—যেন সৈন্যদল-পরিবেষ্টিত সেনাপতি।

এখন আমার ধ্রুব ধারণা জন্মিয়াছে, কালাচাঁদ কোন লোককে কল্য রাত্রে সহায়-সম্পত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। আজ তাই তাহার উপদেশ মত, সৌহার্দ্দভাবে বিষয়ের অংশ লইতে কালাচাঁদ আসিয়াছে। সে লোক অবশ্যই বলিয়াছে, যদি বন্ধুত্বে কার্য্যশেষ না হয়, অন্তিমে নালিষ করাইয়া বিষয় দখল দেওয়াইয়া দিব। তাই সে ব্যক্তি মাছ-দই-সন্দেস দিয়া, প্রথমত কালাচাঁদকে আমার কাছে পাঠাইয়াছে!

বিষয় কি?—সুতরাং কালাচাঁদ তার অংশ লইবেই বা কি? যদি দুষ্ট লোকের দুষ্ট পরামর্শ শুনিয়া কালাচাঁদ বলে,—মৎকৃত এই অতুল বিষয়, জমীদারী সমস্তই পৈতৃক ধনে খরিদ,—তখন উপায়!! কালাচাঁদ যদি আদালতে বলে, "ঠাকুরদাদা দেওয়ানী কাজ করেন, ৫০৲ টাকা মাত্র মাহিনা পান,—তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে কেমন করিয়া এই লক্ষ টাকা মুনফার বিষয় খরিদ করিবেন,"—তাহা হইলে আমি তাহার কি

উত্তর দিব? কালাচাঁদ আদালতে আরও বলিতে পারে, "আমরা একান্ন-ভুক্ত পরিবার,—কস্মিনকালে পৃথকান্ন হই নাই,—যদি পৃথকান্ন পৃথকবাটী হইতাম, তাহা হইলে আমার নিজস্ব ঘর ভিটাই বা কোথায় গেল?" বিশেষ, পৈতৃক পুকুর বাগান জমী—সমস্তই ত উহার ঠাকুরদাদা (আমার জ্যেষ্ঠ) রামতারণদত্তের নামে খরিদ,—মোকদ্দমা-সূত্রে সে দলিল দুইবার আদালতে দাখিল হইয়া তাহা পাকা হইয়া আছে! সেই পুকুর বাগান-জমী-ভিটা সমস্তই আমি দখল করিতেছি। বর্ত্তমান সমস্ত জমীদারীই আমার নামে খরিদ,—(কেবল কোম্পানীর কাগজ গুলি গিন্নীর নামে আছে)। কালাচাঁদ আপত্তি তুলিবে, "যখন আমার নিজ ঠাকুরদাদার নামীয় সম্পত্তির উনি অর্দ্ধেক দখলিকার, তখন উহাঁর নামীয় সম্পত্তির আমি অর্দ্ধেক দখলিকার হইব না কেন?"

কালাচাঁদ বোধ হয় আদালতে আরও বলিবে,—বাল্যকালে আমার পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ

হয়,—এতদিন নাবালক ছিলাম;—এক্ষণে সাবালক হইয়া এই নালিষ উপস্থিত করিয়াছি।

এইরূপ ভাবিয়াই আমি প্রাতে কালাচাঁদকে তত আদর করিলাম। মনে ঠিক করিলাম, কালাচাঁদকে এখন বশ করাই আমার পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেয়ঃকল্প। কালাচাঁদ ছেলে-মানুষ,—দুটা মিষ্ট-কথায় ভুলাইয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া, বাছাধনকে বশে আনিব। কালাচাঁদের কাঁচা বয়স্,—হাতে নগদ কিছু টাকা ফেলিয়া দিব,—তাহাতেই সে ভোর্ হইয়া থাকিবে! মোদ্দা কালাচাঁদকে আর ছাড়া হইবে না।

পাঁচ চাল আঁচিয়াই প্রাতে ব'ড়ে টিপিয়াছিলাম। কালাচাঁদ ভাল-সামগ্রী উদর পূরিয়া খাইতে পায় না,—তাই তাহাকে আজ দ্বিপ্রহরে মহা-মহোৎসবে ভোজন করাইলাম। এঁ-এঁ,—কালাচাঁদ বশে থাকিবে না কি?—শিক্‌লি কাটিয়া পলাইবে কি?—কিছুতেই কি সে পোষ মানিবে না?—কিছুতেই কি তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিব না?

যদি একান্তই বশে না থাকে, তখন উপায়?—না থাকিলে—ভাবনাই বা কি আছে?—অবশেষে আমি 'মরিয়া' হইয়া, ঢাল খাঁড়া ধরিব! বালক-কালাচাঁদ কতক্ষণ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে?—ঐ এক-রত্তি ছেলে, আমার কি করিবে?—ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিব! ভয় কি?

তবে কিনা,—এরূপ ভাবে একটা নালিষ-ফসাদ হইলে, দেখিতে শুনিতে বড়ই মন্দ হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষ, আমার অনেক শত্রু আছে। এই জ্ঞাতি-বিরোধ দেখিয়া শত্রুদের আনন্দ বাড়িবে। তা বাড়ে, বাড়ুক। তা'তেও হরিতারণ দত্ত ভয় খান না!!

কিন্তু ভিটা, পুকুর, বাগান—কালাচাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য। এগার বিঘা জমীও তাহার প্রাপ্য। তা, এগার বিঘা কেন, একশত বিঘা জমী লইয়া, সে ক্ষান্ত হউক,—আমি তাহাতে রাজী আছি। একশত বিঘাই বা বলি কেন, সে পাঁচশত বিঘা জমী লউক, নগদ পাঁচশত টাকা লউক,—আর

আমাকে একটা একরার্-নামা লিখিয়া দিউক্ যে, কি বাস্তুভিটা, কি বাগান, কি পুষ্করিণী, কি অন্য কোন সম্পত্তি—কিছুতেই আর কালাচাঁদ দত্তের স্বত্ব নাই” ;—এ প্রস্তাবে আমি সবিশেষ সম্মত আছি।

কালাচাঁদ যদি বলে, আমার টাকা চাই না, জমী চাই না,—চাই কেবল বাস্তুভিটা।—তাহা হইলেই মুস্কিল বাধিবে। ন্যায্য প্রাপ্য না দিলে, লোকেও ত দোষ দিতে পারে!

আচ্ছা, জাল-দলিল তৈয়ারি করিলে হয় না কি? দলিলে এই ভাবে লেখা থাকিবে, কালাচাঁদ দত্তের পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিবার-বর্গের ভরণ-পোষণের জন্য আমাকে ভিটা, বাটী, পুকুর, বাগান সমস্তই বিক্রয় করিয়া গিয়াছে!

তাহাই বা কেমন করিয়া হয়? কালাচাঁদের মামা পুকুরে মাছ ধরাইত, চালে খড় দিয়া ঘর ছাওয়াইত, বাগানের আম পাড়াইয়া লইয়া যাইত ;—এ সকল কথা ত অনেকেই জানে।

তবে কেমন করিয়া কালাচাঁদের পিতা-কর্ত্তৃক তদীয় বিষয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিব?

যাউক ও কথা। ঝগড়া-গণ্ডগোল করা অপেক্ষা প্রথমত কালাচাঁদের সঙ্গে ভাব করাই ভাল! প্রাণপণে সে চেষ্টা করাই এক্ষণে যুক্তি-সঙ্গত! আমি লক্ষ লোক ভুলাইলাম, আর কালাচাঁদকে কি ভুলাইতে পারিব না? অবশ্যই সে কার্য্যে সক্ষম হইব।

কিন্তু এক গোল দেখিতেছি। গিন্নী যেরূপ কালাচাঁদকে স্নেহ করিতেছেন, তাহাতে কালাচাঁদকে কিছুতেই এ-বাড়ীতে রাখা সু-পরামর্শ নহে। আমি গিন্নীর জ্বালায়, জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিলাম! গিন্নী তাহাকে এত ভাল বাসিবেন জানিলে, কে আজ কালাচাঁদকে বাড়ী ঢুকাইত। পূর্ব্বে-পূর্ব্বে গিন্নী মধ্যে মধ্যে বলিতেন বটে, "কালাচাঁদ কোথা?—তার কিছু খবর জান কি?" আমি এ-সব কথা কৌশলে উড়াইয়া দিতাম। অধিক কি, কালাচাঁদ যখন হুগলী-জেলে ছিল,—তখন একদিনের তরেও

সে-কথা গিন্নীকে বলি নাই। এখন বুঝিতেছি, সে সব কথা না বলিয়া ভালই করিয়াছিলাম। গিন্নী যে, কালাচাঁদকে দেখিয়া এরূপ হায়-হায় করিবেন, স্নেহ-রসে গলিয়া চোখের জল ফেলিবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই! ওঃ—আজ কি কুকর্ম্মই করিয়াছি?—কেন আজ কালাচাঁদকে ঘরে ঢুকিতে বলিলাম, কেন তার সঙ্গে একত্র আহার করিলাম, কেনইবা গিন্নীর সহিত তাহার সাক্ষাতের সুবিধা করিয়া দিলাম? গিন্নী যখন কালাচাঁদকে বাড়ীর ভিতর অদ্য দুপুর-বেলা শুয়াইয়াছেন, তখন গিন্নী যে বলিবেন, কালাচাঁদ এ বাড়ীতে খাবে--মাখ্‌বে-থাক্‌বে—সে'ত একরকম নিশ্চয় ধরা কথা! এরূপ প্রস্তাব গিন্নী করিলে, আমি কি বলিয়া তাহাকে নিষেধ করিব? গিন্নী যদি লুকাইয়া-লুকাইয়া কালাচাঁদকে টাকা-কড়ী দেন, তাহারই উপায় আমি কি করিব? মহাবিপদ্ ঘটিল—দেখিতেছি!

কালাচাঁদকে বশে রাখিতে হইবে, খুব ভাল-

বাসিতে হইবে, ভরণপোষণ করিতে হইবে,—অথচ কালাচাঁদকে বাটীতে থাকিতে দেওয়া হইবে না,—তাহারই বা সংযুক্তি কি?

এখন কথা হইতেছে, গিন্নী যদি জেদ্ করিয়া বলেন, কালাচাঁদ এই বাটীতেই থাকিবে;—বালক-কালাচাঁদও যদি জেদ্ ধরে, "হাঁ আমি এইখানেই থাকিব;"—তখন উপায় কি? কুল-কিনারা ত কিছুই দেখি না!

এখন আমি করি কি? যে দিকে চাই, সেই দিকেই অন্ধকার দেখি। যে পথে চলিতে যাই, সেই পথেই বাধা বিঘ্ন সমুপস্থিত হয়। যে ডাল ধরি, সেই ডালই ভাঙ্গিয়া পড়ে। আজ আমার কাছে জাহ্নবী-জল কক্কুর-মূত্র হয়। পদ্মপত্র বিছুটিতে পরিণত হয়। সুধা, বিষ হয়। আমি করি কি? কোন্ পথ দেখি? কোন্ দিক্ রাখি? কোন্ পাশ বাঁধি? উঃ, গেলাম! আমি কোথায় যাই! কার কাছে যাই! কিসের কথা বলি! আমার কে আছে? আমার কি

আছে ? আমার কে নাই ? আমার কি নাই ?—ইহা'ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

উঃ, আমার বুক বড়ই ধড়াস্‌-ধড়াস্‌ করিতেছে, মাথা বন্‌বন্‌ ঘুরিতেছে, দেহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! আমার মনে দেখা দিতেছে, বুঝি ঐ মহাপাপ কালাচাঁদ কর্ত্তৃক আমার বিষয়-সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইল! বুঝি কালাচাঁদ আমার জিহ্বা টানিয়া ধরিয়া, আমার প্রাণ-বধার্থ উদ্যত হইয়াছে। আমি কোথাই যাই ? কোথাই গেলে রক্ষা পাই ?

বৃদ্ধ হরিতারণ দত্ত, সে রাত্রে প্রকৃতই এইরূপ ছট্‌ফট্‌ আই-ঢাই করিতে লাগিলেন। কখন্‌ যে কি কথা ভাবেন, তাহার কিছুই ঠিক থাকে না! তিনি কোনরূপ সু-মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন না! তিনি যখন যে মন্ত্রণাটী স্থির করেন, তখনই তাহার শত শত দোষ দেখিতে পান।

বৈশাখের সেই কালরাত্রে আদৌ ঠাকুরদাদার চক্ষে ঘুম আসিল না। তাঁহার দেহ যেন তুষানলে

দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার হৃৎপিণ্ডটা হামান-দিস্তায় কে যেন থেঁতো করিতে লাগিল। তাঁহার চোখে কে যেন অসংখ্য ক্ষুরধার ছুঁচ বিঁধিতে লাগিল।

ঠাকুরদাদা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া "ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন,"—ডাক ছাড়িতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কবি কহিয়াছেন,—

কর্ম্মফলে কপালে কেবল সুখ-দুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক॥
স্কন্ধে করি বয় কেহ, কেহ চাপে স্কন্ধে।
যত দেখ ফলাফল সেই কর্ম্ম-বন্ধে॥

ঠাকুরদাদা এ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া,—কষ্ট পাইতেছেন,—কেবল সেই আপনার কৃত-কর্ম্মের ফলে। কালাচাঁদ এই রাজাবিশেষ ঠাকুর-দাদার নাতী হইয়াও, স্বয়ং ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রশস্ত-মনা হইয়াও, কষ্ট পাইতেছেন,—কেবল সেই আপনার কৃতকর্ম্মের ফলে।

কালাচাঁদ, ঠাকুরদাদার কাছে ভিটার ভাগ লইতেও আইসেন নাই, বিষয়ের অংশ লইতেও আইসেন নাই,—আসিয়াছেন, আপন খেয়ালে, আপন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য। কালাচাঁদ এখনও

জানেন কিনা সন্দেহ যে,—তাঁহার ভিটায় ঠাকুরদাদা এক ত্রিতল অট্টালিকা বিনির্ম্মিত করিয়াছেন;—স্বগ্রামে তাঁহার পুকুর বাগান ভিটা আছে কিনা, হয় ত এখন তাঁহার মনেই নাই! মনে থাকিলেও, সে দিকে এক্ষণে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র দৃক্‌পাতও নাই! সে ভিটায় বসবাসের স্বত্ব ঠাকুরদাদারই হউক, অথবা শৃগাল-কুক্কুর-সর্পেরই হউক,—সে সম্বন্ধে কালাচাঁদের কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি আসিয়াছেন, আপন মনে, অন্য কারণে,—ঠাকুরদাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

কোথায় কিছুই নাই,—মেঘ নাই, বিদ্যুৎ নাই, বজ্রাঘাত নাই,—অথচ ঠাকুরদাদা যন্ত্রণায় অস্থির! সর্ব্বদিক্ সুপ্রসন্ন, ধূলা-রহিত বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে, নীলাকাশের কোল দিয়া বক-কুল উড়িয়া যাইতেছে,—অথচ ঠাকুরদাদা কাতর,—মর্ম্মপীড়াগ্রস্ত, যেন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত! কেন এমন হয়?—সেই কেবল কর্ম্মফল।

কালাচাঁদ যে, আজ প্রায় তিন দিন খাইতে

পাইলেন না, তাহাও কর্ম্মফল। ভূরি-ভোজনের মহামহোৎসবে, একশত আট রকম ভোগের সুবন্দোবস্তে, কালাচাঁদের উদরের এক কোণের এক-ষোড়শাংশও যে পূর্ণ হইল না,—ইহাও সেই কর্ম্মফল।

কালাচাঁদ ঠাকুরদাদার নিকট কেন আসিলেন? কেন হঠাৎ তাঁহার এরূপ মতিগতি ফিরিল? কালাচাঁদ আজ ছয় মাস কাল হুগলীতে আছেন;—একটী-দিন ব্যতীত, তিনি ঠাকুরদাদার হুগলীস্থ বাসাবাটীর উঠান মাড়ান্ নাই; এবং সেই একটী দিনেও তিনি ঠাকুরদাদার উপর মহা-বিরক্ত হইয়া সে বাসা পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। যদি এমনটাই হইল, তবে আজ আবার এরূপ বিপরীত ভাব ঘটিল কেন?

আজ শুধু আগমন নয়,—মাছ-দই-সন্দেস লইয়া আগমন,—হাসি-হাসি মুখে, ভাবে গদ্‌গদ হইয়া আগমন,—প্রেম-প্রীতি-ভরে যেন মাটীতে লুটাইতে লুটাইতে আগমন! কেন এমন হয়?

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি,—কালাচাঁদ-চরিত্র আঁকা বড় কঠিন,—বুঝা ততোধিক কঠিন! যদি এ কালাচাঁদ-কীর্ত্তি-কলাপের কোন কথা কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে জানিবেন, হয় আমার লিখিবার দোষ, না হয় তাঁহার বুঝিবার দোষ। অধিকাংশ বাঙ্গালী-পাঠকই অন্তঃসার-শূন্য,—উপর দেখিয়াই উন্মত্ত,—বাহ্য-চাকচিক্যে বিমোহিত। লিখিবার দোষটুকু যে, বুঝিয়া, সারিয়া লইবেন,—সে আশাও কম।

সেই আশা কম বলিয়াই, প্রতিপদে কৈফিয়ত দিতে হয়। বাজে কৈফিয়তে বিজ্ঞ পাঠকের বড়ই বিরক্তি জন্মে। বিজ্ঞ, বড়জোর হাজার-করা একজন। নয়শত নিরানব্বই জন লেখাপড়া শিখিয়া মা-সরস্বতীর বরপুত্র। এই বরপুত্রগণকে উপেক্ষা করিয়া, পশ্চাতে ফেলিয়া যাওয়া কি উচিত? কাজেই কৈফিয়ত দিতে হয়!

কালাচাঁদ চরিত্র বিচিত্র। সাদা, লাল, কালো—সবরকম রঙই আছে। সরু-মোটা, তিক্ত-মধুর,

নরম-গরম—সকলপ্রকার ঢঙই আছে। কালাচাঁদ কখন স্বর্গে কখন মর্ত্তে, কখন পাতালে—এ চরিত্র কি আঁকা যায়?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহাক্ষুধায় প্রপীড়িত কালাচাঁদ গতকল্য নিশীথে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, আপনমনে স্থির করেন,—"চুরি করায় কোনও দোষ নাই।" পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন চুরি করিতেন, তখন তাঁহার ধারণা ছিল, যে,—তিনি একটা মন্দ কাজ করিতেছেন। ক্রমশ চৌর্য্যকর্ম্ম অভ্যস্ত হওয়ায়, মন্দ-কাজ-করার আঘাত তাঁহার হৃদয়ে বড় একটা লাগিত না। তবে স্থূলত এই বিশ্বাস ছিল, চুরি করা অপকর্ম্মের মধ্যে গণ্য। তৎপরে গ্রহ-বৈগুণ্যে তাঁহার কারাবাস হয়। তিন বৎসর কাল কারা-কূপে বাস করার পর, তিনি যখন খালাস পাইলেন, তখন পৃথিবীকে যেন নূতন দেখিলেন। আলোকমালায় বিভূষিত, স্বচ্ছন্দ-বিহারী পক্ষীকুলদ্বারা ধ্বনিত, সুখস্পর্শ সমীরণ সেবনে সদা প্রফুল্লিত—ধরাধামের এইরূপ অপূর্ব্ব রঙ্গ-ভঙ্গ দেখিয়া কালাচাঁদের হৃদয়ে কেমন এক অভিনব

উল্লাসের উদয় হইল। কারাগারেও কালাচাঁদ একরকম সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সে সুখ রাজার সুখ, ব্যবসাদারের সুখ,—নিকৃষ্ট লৌকিক সুখ। কিন্তু মুক্তির পর যে সুখোদয় হইল, তাহা যেন ঋষির সুখ,—নির্ব্বাণমুক্ত পুরুষের সুখ। কালাচাঁদ সদানন্দ পুরুষ হইলেন। অন্ধব্যক্তি বহুদিন পরে, বহুকষ্টে চক্ষুরত্ন-লাভ করিয়াছে, আর কি রক্ষা আছে? কালাচাঁদের কি আহ্লাদের সীমা আছে?

ক্রমশ কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন,—"কেন মিছে চুরি করিয়া মরি!!"—এইবার কিন্তু সুখে দুঃখ আসিল। ভাবনাই দোষ। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ের সেই পরম উল্লাস,—সেই নির্ব্বাণ-মুক্ত পুরুষের ন্যায় সুখ কমিল! সুখ কমুক,—তিনি কিন্তু চুরিবৃত্তি ছাড়িয়া দিলেন; লোকের দুঃখ-দূরীকরণার্থ তাঁহার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন,—স্ত্রীমণ্ডলী তাঁহার কাছে জননীর ন্যায় পূজনীয়া হইলেন।

কালাচাঁদের দেহে ভাবনা-কীট প্রবেশ করিল। কি ভাবনা,—তাহা কালাচাঁদও ভাল বুঝিতে পারেন না। মোদ্দা,—তিনি কেবল ভাবেন!—নীরবে, নিস্পন্দে কখন হয় ত এক প্রহর কাল এক স্থানে বসিয়া থাকেন! অন্নে রুচি কমিল। দেহও যেন কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইল।

কালাচাঁদের ভাবনার আদি-অন্ত-মধ্য নাই—আরম্ভ-শেষ-সীমা নাই,—মাত্রা-ওজন-পরিমাণ নাই,—আছে কেবল, ভাবনা আর ভাবনা! ভাবনার অনন্ত সমুদ্র;—যে দিকে চাই, সেই দিকেই ভাবনা! মধ্যে মধ্যে আবর্ত্ত-বুদ্‌বুদ-তরঙ্গ-ফেন-সঙ্কুল।

কালাচাঁদ কখন ভাবেন,—"আচ্ছা, আমি পতিতপাবনের আশ্রয়ে থাকি কেন? পতিত'ত পাকা গাঁটকাটা, তাহার সহবাসে থাকিলে ত আমারও দেহমন কলুষিত হইতে পারে। কিন্তু পতিতকে ত্যাগ করিই বা কেমন করিয়া? পতিত আমার প্রথম আশ্রয়দাতা। আশ্রয়দাতাকে উপেক্ষা করা ত কখনই উচিত নহে! করি কি?"

কালাচাঁদ আরও ভাবেন, “পতিত যে আমাকে সহজে ছাড়িবে, এমন ত বোধ হয় না। পতিত আমার নিকট হইতে পয়সা পায়, খাবার সামগ্রী পায়, মিষ্ট কথা পায়। এমন কল্পতরুকে সহজে কে ত্যাগ করিবে? আমার যদি কখন পয়সা কমে, তথাচ পতিত আমাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। কারণ পতিত জানে, আমার ক্ষমতা অসীম। আজ যদি পয়সা না থাকে, তুদিন পরে আবার অনেক পয়সা হইতে পারে।”

“আর আমার পয়সাই বা কমিতে গেল কেন? সৎপথে থাকিলে ‘অর্দ্ধেক-রাত্রে অন্ন হয়’। আমি ত এখন আর কোন মন্দকর্ম্ম, অসৎকর্ম্ম, পাপকর্ম্ম করিতেছি না যে, আমি অন্নাভাবে বা অর্থাভাবে কষ্ট পাইব? সাধু ব্যক্তি সদাই সুখী,—আমার অসুখ হইবে কেন?”

“পতিতপাবন শঠ, প্রবঞ্চক, চোর হউক,—আমাকে বুঝি সে যথেষ্ট ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। সে-দিন আমার জ্বর হইল, পতিত আমার কত

সেবা-শুশ্রূষা করিল। প্রকৃতই পতিতের আমার প্রতি যেন বড়ই মমতা জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চোর-ডাকাতদেরও-ত স্ত্রীপুত্র পিতা-মাতার প্রতি স্নেহ-ভক্তি আছে,—এস্থলে, পতিতের আমার প্রতি ভক্তি-ভালবাসা না থাকিবে কেন?”

“অতএব যে-দিক্ দিয়া, যে-ভাবেই দেখি, পতিতের হাত হইতে কোন দিকেই পরিত্রাণ দেখিতে পাই না। অথচ পতিতের গৃহে, পতিতের সহিত একত্র বসবাস করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে! করি কি?”

“আচ্ছা, পতিতের গৃহে থাকিতেই বা দোষ কি? পতিত মন্দ হয়, হউক; আমি মন্দ না হইলেই ত হইল। সত্য বটে, মিথ্যাকথা পতিতের অঙ্গের ভূষণ। কিন্তু তা’ হউক;—আমি মিথ্যাকথা না কহিলেই ত হইল। নিজে খাঁটি থাকিলে, অপরে কে কি করিতে পারে? আমার কি এরূপ শক্তি নাই যে, আত্ম-সমর্থনপূর্ব্বক আমি এ সংসারে অবস্থান করি? শক্তি আছে বৈ কি?

আর, শক্তি থাকিলে সবই সম্ভব। শক্তি ছিল বলিয়াই, মহাদেব কণ্ঠে মহাবিষ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর, আমি কি এমনই অক্ষম যে, আমি এই ক্ষুদ্র পতিতের সংস্রবে থাকিতে সক্ষম হইব না?”

কালাচাঁদের চিন্তাস্রোত এই ভাবেই প্রবাহিত। তিনি কখন্ কোন্ কথা ভাবেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই। “কুলবধূর প্রতি কটাক্ষপাতে দোষ কি? কেবল চোখের দেখা একবার দেখিয়া লইব বই’ত নয়,—ইহাতে কোন পক্ষেরইত ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। পুরুষের নয়ন-কর্ত্তৃক একদৃষ্টে নিরীক্ষিত হইলে, রমণীর কোমল অঙ্গ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কি? দৃষ্টি কি মহাদ্রাবক? না,—ব্রহ্মাস্ত্র? ও-সব কিছুই নয়। কেবল দেখা। দেখায় আসে-যায় কি? গোলাপফুল, মল্লিকাফুল, চাঁপাফুল,—একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলে ত কেহ দোষ দেয় না। সুন্দরী-রমণী সংসার-অরণ্যের প্রস্ফুটিত পদ্ম-পুষ্পের তুল্য;—ক্ষণভঙ্গুর মানব-দেহ ধারণ করিয়া, স্বভাবের সে

শোভা সন্দর্শন-পূর্ব্বক নয়ন সার্থক না করিব কেন? শরদাকাশে বৎসরান্তে দুইটী দিন মাত্র সুধাকর পূর্ণচন্দ্র উদিত হন, কিন্তু এই ধরাধামে কত সুধামুখীর মুখচন্দ্র বারমাস ভূমে গড়াগড়ি যায়। আকাশের চন্দ্রটীকে দেখিলে কোন দোষ নাই,—কিন্তু এই পৃথিবীর চন্দ্রের পানে চাহিলেই যত গোলযোগ!

ভাল হউক মন্দ হউক, দোষ হউক গুণ হউক,—আমি সতী সুন্দরী রমণীর মুখ-চন্দ্রের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিব। চাহিয়া, চাহিয়া, বিধাতার সৃষ্টি-নৈপুণ্য দেখিব। মনে মন্দভাব না থাকিলেই হইল।

দেখিব ত মনে করি,—কিন্তু কেমন বাধ-বাধ ঠেকে! কেমন যেন চক্ষুলজ্জা হয়। রমণীর সঙ্গে যদি চারি-চক্ষে চাওয়া-চায়ি হইয়া যায়, তাহা হইলে ত গিয়াছি! স্ত্রীলোকটী মনে করিবে কি? সে যদি ভাবে, আমি কামভাবে তাহার পানে তাকাইয়া আছি, তাহা হইলে ত এ কাজ বড় সুবিধাজনক

নহে। তখন সেই কুলবালা লজ্জায় কতই না ম্রিয়মাণ হইবে! হয় ত ভয়ে থরহরি কাঁপিবে! আর, আমাকে মনে করিবে, এ একটা দুষ্ট, পাপিষ্ঠ, লম্পট পশু! আর এক কথা,—যদি সেই কুলবালাটী কুচরিত্রাই হয়,—তাহা হইলেই ত সে-ও এক মহামুস্কিল কাণ্ড। সে আমাকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, আমিও তাহাকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম! তখন ত ঘোর বিপদ্ ঘটিয়া উঠিবে! অগত্যা আমি তাহার রূপমাধুরী দেখিতে ক্ষান্ত হইলাম; কিন্তু সে যদি আর ক্ষান্ত না হয়,—আমাকে দেখিতেই থাকে,—আর বলে, 'আমি কেবল স্বভাবের শোভামাত্র দেখিতেছি;—সুতরাং তাহাতে আমার লজ্জা ত নাই-ই, কিন্তু তোমার হঠাৎ এমন শুধু-শুধু লজ্জা হয় কেন? অতএব হে নবীনপুরুষ-বর! তুমি চক্ষু তুলিয়া, আয়ত-লোচনে আমার প্রতি চাহিয়া থাক।'—তখন উপায়?

এ যে বড় বিষম দায় দেখিতেছি। সুন্দরী—

যুবতী—জিনিসটাই খারাপ্! ওর ভাল-মন্দ ভেদ নাই, বাস্তু-উট্‌কো বিচার নাই, নরম-গরম তারতম্য নাই,—ঐ বস্তুটাই বদ্!—দপ্‌দপে আগুণের খাপ্‌রা! দূর হইতে মনে হয়, বুঝি ঐ আমার সাতরাজার ধন একটী নীলকান্তমণি জ্বলিতেছে!—কিন্তু কাছে গেলেই পুড়িয়া ছাই হইতে হয়! এই কথাই ঠিক্! অন্যের দেখিয়াছি, নিজে ভুক্তভোগীও বটি,—একবার ঝোঁক ধরিলে ত আর রক্ষা নাই! তখন বাষ্পীয় কলেও, সে বেগ টানিয়া রাখিতে পারে না!

আরও একটা কথা শুনিয়াছি,—ঘ্রাণে অর্দ্ধ-ভোজন। যদি স্পর্শনে পূর্ণ পাপ হয়, তবে দর্শনে অর্দ্ধ পাপ না হইবে কেন?

আরও কথা আছে। ক্রমশ দেখিতে দেখিতে যদি লোভ জন্মিয়া যায়!—তখন উপায়? প্রথমে না হয় স্বভাবের শোভা বলিয়াই দেখিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু শেষে যদি গোল বাধে?—তখন রক্ষা করিবে কে? মন যদি মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়

বৃংহিত ধ্বনি করিয়া উঠে, তবে তখন তাহাকে থামাইবে কে? মনকে বিশ্বাস কি? মনটী ঠিক্ কালসাপ। দেহ-গৃহে বাস। দেখিতে বেশ ভাল-মানুষটীর মত। কিন্তু সুবিধা পাইলেই কুট্ করিয়া কামড়!—অমনি বিষে জর্জ্জরিত দেহ!

আচ্ছা,—সুন্দরীর রূপমাধুরী নাই বা দেখিলাম!—তাহা হইলে ত সকল গোলই চুকিয়া যায়! মেয়েমানুষের মুখ না দেখিলে যে, হাঁড়ী-চড়া বন্ধ হয়—এমন ত কিছু নয়? বলিতে পার, স্বভাবের সুন্দর শোভা সন্দর্শনে বঞ্চিত হইলাম। স্বভাবের ঐ শোভাটী না দেখিলে কি তোমার সংসার অচল হয়? আরও ত অন্যরকম শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ শোভা রহিয়াছে,—তাহাই কেন দেখ না? নীলাকাশ দেখ না? অনন্ত কাল, বসিয়া বসিয়া, চাহিয়া চাহিয়া নীলাকাশ দেখ না? আকাশ পছন্দ না হয়,—সবুজ ময়দান দেখ। বেশ লহ-লহ ঘাস-পূর্ণ মনোহর মাঠ দেখ। ঘাসে রুচি না হয়,—সেণ্টহেলেনা-দ্বীপে বসিয়া, অনন্ত-

বিস্তৃত, তরঙ্গভঙ্গময়, সমুদ্র সন্দর্শন কর। স্বভাবের শোভা দেখিতেই যদি এত সাধ, তবে হিমালয়ে যাও—ধবল-গিরিতে বাস কর। সাহারায় যাও,—মরুভূমে ভ্রমণ কর। কেবল মেয়েমানুষের সেই মুখটী না দেখিলে কি তোমার স্বভাবের শোভা দেখা হয় না? ছি!!

রমণী জননীর ন্যায় পূজনীয়া। কুলবধূ—দেবী—স্বর্গের সামগ্রী। দুর্ব্বল মানব সেই দেবীর মুখকমল দেখিবার অধিকারী নহে,—উপযুক্ত নহে। এই কথাই ঠিক্। কুলকামিনী সম্মুখে সমুপস্থিত হইলে, আমি কেবল তাঁহার চরণযুগল নিরীক্ষণ করিয়াই নয়ন সার্থক করিব।”

কালাচাঁদের রমণী-সম্বন্ধিনী ভাবনা এইরূপই। সম্যক্‌রূপে এ ব্যাপার বর্ণন করিতে সক্ষম হইলাম কি না—জানি না! কেন না, এরূপ ভাবনার কূল-কিনারা নাই! কখন এই,—কূলের কাছে, কখন ঐ,—মাঝ-দরিয়ায়! কখন তরণীর কোলে নিশ্চিন্ত মনে সুখ-শয্যায় শয়ান, কখন গভীর

আবর্ত্তে পড়িয়া নিরন্তর ঘূর্ণমান! কিছুই ঠিক নাই,—কেমন করিয়া এ কাহিনী কীর্ত্তন করিব?

কালাচাঁদ যে, একটী-দিন-মাত্র একবেলা বসিয়া স্ত্রীলোক-ঘটিত বিষয় ঐরূপ ভাবিয়াছিলেন, তাহা নহে। দিন নাই, রাত নাই, যখন খেয়াল চাপিত, তখনই ঐ কথা তোলাপাড়া করিতেন। হয় ত একই কথা একশ-বার প্রস্তাব, আলোচনা এবং মীমাংসা করিতেন। কিছুরই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না।

কারাগার হইতে কালাচাঁদ কয়েক-শত টাকা আনিয়াছিলেন। কিন্তু পতিত-পাবনের বাসায় অবস্থানকালে তিনি অর্থের উপর নির্ম্মম হইলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করেন, টাকা ত খোলাং-কুঁচি,—টাকাতে আছে কি? একটা সাদা চাক্‌তি বৈত নয়? এই টাকার জন্য মানুষ মারামারি করে, রক্তপাত করে,—এই টাকার জন্য বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়, পিতাপুত্রে বিবাদ হয়, মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। টাকাটা বড় বদ্ জিনিস—উহা ঘরে রাখিতে

নাই। অতএব কর বিদায়—টাকা। সম্মুখে সুপাত্র দেখিলেই—দাও টাকা। বস্ত্রহীনের বস্ত্র কিনিয়া দাও; ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা-শান্তি কর; পিপাসার্ত্তকে শীতল জল দাও।

কালাচাঁদ দানের উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া দান-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কাহাকেও চারি-আনা, কাহাকেও আট-আনা, কাহাকেও একখানা কাপড়, কাহাকেও ডুইসের চাউল,—কালাচাঁদ সাধ্যমত দিতে লাগিলেন। কালাচাঁদকে ঠকাইতে লাগিল,—কেবল বন্ধু-পতিতপাবন পরামাণিক। যাহার কোন অভাব নাই, পতিতপাবন তাহাকে ছেঁড়া কাপড় পরাইয়া, দুঃখী সাজাইয়া, কালাচাঁদের নিকট আনিত; কালাচাঁদ সেই দুঃখীকে যাহা দিতেন, পরামাণিক তাহার অর্দ্ধেক ভাগ তাহার নিকট হইতে লইত। কালাচাঁদ এ সব বুঝিয়াও, তাহা উপেক্ষা করিতেন। যে মাছটীর মূল্য পাঁচ আনার অধিক নহে, পতিত সেই মাছটী বাজার হইতে হাতে করিয়া আনিয়া বলিত, "বন্ধু! তোমার জন্য

৸১৭॥ বার আনা সাড়ে তিন পয়সা দিয়া এই মাছটী এনেচি!—এর কি আমি দাম নিতে পারি?—তুমি খেয়ো।” বলা বাহুল্য, কালাচাঁদ সে মাছের কথিত মূল্যত দিতেনই, অধিকন্তু সে মাছের বার আনা অংশ উপহার স্বরূপ বিনামূল্যে বন্ধু-পতিতপাবনকে অর্পণ করিতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনন্ত গুণাকর [illegible]মাণিকের আর একটী অন্তরের সাধ ছিল। [illegible] আশা ফলবতী করণার্থ সেই নাপিত-কুল-ধুরন্ধর বহুবিধ বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই সেই প্রাণের সাধ পূর্ণ হয় নাই।

সেটি কি? এমন কিছু বিশেষ বিষয় নয়, যাহার জন্য ঔৎসুক্যের আবশ্যক! এই,—কিঞ্চিৎ মদ এবং বেশ্যা। এই, কি জান্‌লেন্‌,—কালাচাঁদ একটু আমোদ-প্রমোদ করেন, সুখে-স্বচ্ছন্দে হেসে-খেলে বেড়ান—বন্ধু-পতিতের ইহাই ইচ্ছা। কালাচাঁদের এই উঠ্‌তি বয়স্‌,—একটু-আধটু নেশা না করিলে মনের স্ফূর্ত্তি হবে কেন? আর, কালাচাঁদের এই ঘোরতর যৌবনে রমণী ব্যতীত শয্যাগৃহ সজ্জিত হয় কি?—পরমবন্ধু পতিতপাবনের অন্তরে অহর্নিশি এ সকল কথাই উদিত হইত।

এ দিকে যোটকতাকার্য্যে পতিতপাবন কথঞ্চিৎ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার নানাস্থানে যাতায়াত ছিল, নানা নর-নারীর সহিত আলাপ ছিল।

কালাচাঁদ এক দিন পতিতের ঘরে একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী মেয়েমানুষ আসিয়া দাঁড়াইল। বয়স্ তার বছর বাইশ। আধ্-ঘোম্‌টা দেওয়া। পরণে রাঙ্গাপেড়ে শাড়ী। হাতে বেলওয়ারি চুড়ি। কপালে একটী টিপ্। মেয়েটী আসিয়া দাঁড়াইতে না-দাঁড়াইতে, পতিত দৌড়িয়া আসিয়া কালাচাঁদকে বলিল,—"বন্ধু! এই ঝীটিকে অনেক কষ্টপেয়ে খুঁজে খুঁজে এনেচি। বড় ভাল মেয়ে এটী। অতি-ঈ সৎ। মুখে কথাটী নেই। যখন যা বল্‌বে, তখনি তাই কর্‌বে! ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, বিছানা করা, পান সাজা—সকল কাজই এঁর দ্বারা হবে। জাতিতে সৎগোপ। বন্ধু। প্রত্যহ উনুন ধরিয়ে রেঁধে খেতে তোমার কষ্ট হয়,—তা, ইনি থাক্‌লে, সে সব কিছু দেখ্‌তে হবে না! আর, তোমার

ঘুম থেকে উঠে রাত্রে দু-তিনবার তামাক খাওয়া আছে; তা, এঁকে বল্‌লে,—ইনি এই ঘরের দাওয়ায় রাত্রে শুয়ে থাক্‌তে পারেন,—আর উঠে উঠে তোমাকে তামাক-টামাক সেজে দিবেন। এঁকে কিছু বেশী মাইনে দিয়ে, রাত-দিনের ঝী ক'রে রাখ্‌লে, বন্ধু! তোমার আর কোন ক্লেশ হবে না।"

স্ত্রীলোকটীকে সম্মুখে রাখিয়া পতিত এই ভাবেই বক্তৃতা করিতে লাগিল। কালাচাঁদ সেই ঝীটির ত্রিভঙ্গ ঠাট্‌ দেখিয়াই অবাক্‌! সহসা তাঁহার মুখ হইতে বাক্যস্ফুরণ হইল না। তখন সাবেক বৃদ্ধা ঝীর গুণকীর্ত্তন ব্যাপারে, পতিতের বক্তৃতা-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিল,—"হরের মা-বেটী বুড়ী, বজ্জাত,—কাণে শুন্‌তে পায় না, চোখে দেখ্‌তে পায় না,—সে, বাসন মাজ্‌লে থালে এঁটো সকৃড়ি থাকে। সে, বেলায় আসে, সন্ধ্যে হ'লেই চলে যায়,—বাজারের পয়সা চুরি করে। বন্ধু! তাকে আর কাজ নেই,—তার বদলে এঁকে রাখ। এ মেয়েটী আমাদের জানা-শুনা লোক,

বিশ্বাসী। স্বভাব-চরিত্তির ঠাণ্ডা। মুখে কথাটী নেই। এমনি এঁর মেজাজ যে, কোন কাজ ক'র্‌বো না, বা কত্তে পার্‌বো না—এমন কথাটী এঁর মুখ দিয়ে কখন বেরুবে না। আর কি জান, বন্ধু! তোমারও ত সুখ-অসুখ আছে। তা, সুখে-অসুখে ইনি তোমার বেশ যত্ন-সেবা কর্‌তে পার্‌বেন।"

স্ত্রীলোকটীর চেহারা দেখিয়া এবং পতিতের কথা শুনিয়া ক্রমশ কালাচাঁদের চক্ষুস্থির! পতিত অবিরত মিথ্যা কথা কয়, ঠকাইয়া পয়সা লয়, চোরাই মাল কিনে,—এ সকল কালাচাঁদের সহ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই বঙ্কিম-ভাবাপন্না, চারুচন্দ্রবদনা, কুটিলায়ত-নয়না স্ত্রীমূর্ত্তিকে দাসীরূপে রক্ষা করিবার প্রস্তাবে তিনি মহাবিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এটী কি গৃহদাসী, না স্বর্গের উর্ব্বশী? ইহাকে যেরূপ সু-পরিষ্কার, সু-পরিচ্ছন্ন, রঙ্গরাগে পরিপূর্ণ দেখিতেছি, তাহাতে এ আমার বাসন মাজিবে কি!—ইহারই যে, বাসন মাজিতে আমার ইচ্ছা হয়! দণ্ডবৎ! কাজ নাই আমার এমন ঝীয়ে!

কালাচাঁদ এরূপ ভাবিলেন বটে, কিন্তু পতিতকে যে হঠাৎ চটাইয়া দিবেন, বা ঝগড়া করিবেন,—এরূপ তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কি কথা বলিবেন, কি উত্তর দিবেন,—কোন্ কথা বলিলে, সবদিক্ বজায় থাকে,—কালাচাঁদ বিব্রত হইয়া ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পতিত, কালাচাঁদের এপর্য্যন্ত কোন উত্তর না পাইয়া আবার বলিল,—"কি বলো, বন্ধু!—তবে কালথেকেই এই মেয়েটী কাজকর্ম্ম করুক—"

কালাচাঁদের মুখে তথাচ কোন কথা নাই। কালাচাঁদ ভাবিতেছেন, "কি বিপদ্! এ যে মহামুস্কিল কাণ্ড বাধালে দেখ্‌চি—"

কালাচাঁদকে আর অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না। সাবেক ঝী,—সেই হরের মা—সেই বুড়ী, ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িল। বলিল, "কুসুমীকে আর, কাল থেকে আস্‌তে বলা কেন? ও এসেচে,—আজ থেকেই কাজ করুক!—আমি এমন চাকুরি কত্তে চাই না! গতর থাকলে ঢের চাকুরি হবে।

ভগমান জীব দিয়েচেন, আহার দেবেন! কুসুমী তোমাদের এখানে থাকুক্, দিনে-রেতের কাজ কর্‌বে!—"

পতিত নীরব। পতিত ভাবে নাই যে, হরের মা এখনি আসিয়া পড়িবে। পতিতের এখন চিন্তা,—"হরের মা যদি সব কথা শুনে থাকে, তা হ'লে একটা হুলস্থূল বাধাবে। আমি তাকে, চোখে দেখ্‌তে পায় না, কাণে শুন্‌তে পায় না,—অবিশ্বাসী-চোর বলেচি;—এ-সব কথা যদি হরের মা শুনে থাকে, তবে সে এখনি একটা কুরুক্ষেত্তর ক'র্‌বে।" বলা বাহুল্য, হরির মাতার শুভাগমনে পতিত নিতান্ত অপ্রতিভ এবং একান্ত বাক্‌শক্তি-হীন হইল।

হরির মা। অগো গেরস্থরা! তোমরা জিনিস-পত্তর বুঝে নাও,—আমি চল্লেম! নাও না গো,—দেরি কচ্চো কেন?

কালাচাঁদ মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—এ সঙ্কটে, এ ঘোর বিপদে

শ্রীমধুসূদনই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। হরির মা! এ জন্মে আমি তোর ধার শুধিতে পারিব না। তুই আজ আমাকে বড় বাঁচিয়েচিস্! তুই ভয় করিস্ না। দুকথা বলে নে! আমি তোকে এক-খানা পাটের কাপড় কিনে দিব।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত হরির মা কোন উত্তর না পাইয়া, অঙ্গের বসন কতকটা উন্মোচন করিয়া, আঁচল ঝাড়া দিতে আরম্ভ করিল। মুখে বলিতে লাগিল, "এই নাও,—তোমরা দেখে নাও—আমি কোন জিনিসপত্তর নিয়ে যাচ্চি কি না?—এই দেখো, এই দেখো—"

ক্রমশ অঙ্গবস্ত্র ঈষৎ অধিক মাত্রায় অঙ্গ-মুক্ত হইতে থাকিল!

পতিত ভাবিল, এ যে ঘোরতর বিপদ্ দেখি-তেছি। মাগী ক্রমশ উলঙ্গ হইবে না কি? তখন আর নীরব থাকিতে না পারিয়া, পতিত অগত্যা হরির মাকে একটু মিষ্ট কথায়, আমৃতা-আমৃতা করিয়া বলিল,—"হরির মা! তুমি অমন কর্চো

কেন? তোমাকে ত এখন কেউ কিছু বলে নাই! তুমিও থাকো না কেন?”

হরির মা। আমার আর কি থাকা-থাকির বয়স্ আছে? আমার হাতে চুড়ি নেই, দাঁতে মিসি নেই, ঠোঁটে আল্তা নেই,—আমার দ্বারা বাসন-মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া চল্বে কেন? আমার যদি মিহি শাড়ী থাক্তো, পেটো-পাড়া চুল থাক্তো,—বেঁকে বেঁকে কোমর ঘুরিয়ে চলা থাক্তো,—তা, হ'লে আজ আমি সোহাগের ঝী হতেম! আমাদের তিন-কাল গিয়ে এক-কালে ঠেকেচে, কাজেই আমরা কাণা, কালা, চোর হয়েচি,—কাজের বা'র হয়েচি। থাকুক্ কুসমী,—ওর এখন চোখ ভাল, সব দেখ্তে পাবে; কাণ ভাল, সব শুন্তে পাবে;—ওর এখন হাতের রস আছে, বাসন মাজ্বে ভাল; ওর এখন পেটে বুদ্ধি আছে, হাটবাজার কর্বে ভাল;—অলো! কুসমী! আয়্লো!—এখন তোর ঘর, তোর দোয়ার হ'লো,—জিনিস-পত্তর সব দেখে-শুনে বুঝে নিবি আয়।

নবাগতা ঝী-রূপিণী মহিলাটীর নাম—কুসুম-কামিনী। হরির মায়ের হঠাৎ এরূপ আগমনে এবং এরূপ বাক্‌বিতণ্ডায় সে-ও কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ এবং বিব্রত হইল। কিন্তু হরির মায়ের এখন ঝগড়ার মুখ,—হঠাৎ কোন কথা কহিলে মিছা গণ্ডগোল বাধিয়া যাইবে,—এই ভাবিয়া কুসুম এতক্ষণ নীরব ছিল। কিন্তু হরির মা ক্রমশ যখন কুসুমের উপরই সকল কথা ঝোঁক দিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, তখন আর সে নীরব থাকিতে পারিল না। ধীর অথচ কঠোরস্বরে বলিল,—"হঁগা, তুমি আমাকে নিয়ে অমন কর্‌চো কেন? তুমি যা ব'ল্‌বে, ওঁদিগে বল—"

হরির মা। তোকে আবার কে কি বল্লে যে,—তোর অম্‌নি ঠ্যাকার হ'লো। সোয়াগে যে, গলে পড়েচিস্ লো!—গরবে যে আর গা ধরে না!—

কুসুম তখন সুর একটু রুক্ষ করিল। উচ্চ-কণ্ঠে বলিল, "তুমি আবার আমার আজ সোয়াগটা

কিসে দেখ্‌লে গ্যা? তুমি যাকে তাকে, যা-না-তাই বল!—কেন বল দেখি?

হরির মা তখন একটা বিকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল,—"অ্যাঁ—কুসুমিলো!

তুই অত করিস্ না—অত করিস্ না।

সজ্‌নে খাড়ার মত যেন ঝুলে পড়িস্ না॥

পাড়া-মজানি! পাড়া-চলানি! সাতপাড়া মজিয়ে আবার এখানে মজাতে এসেচিস্! তোকে কে না জানে লো! তোর সকল কথা বল্‌তে গেলে প্রাচিত্তির কত্তে হয়।"

কুসুমকামিনী তখন 'দশ-বাই-চণ্ডী' হইলেন। নিজমূর্ত্তি ধরিয়া বাহু নাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোকেই বা না জানে কে লো? ডাইনি! রাক্কুসি! তোর মেয়ের খপর্ রাখিস্—সে এখন কোন্ মুলুকে আছে? আগে তোর ঘরের খপর্ রাখ্‌গে লো,—তার পর পরের খপর রাখিস্—"

হরির মা তখন গাছ-কোমর বাঁধিয়া, চক্ষু দুইটী

কপালে তুলিয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণপূর্ব্বক কিড়্-কিড়্-কিড়্-কিড়্ শব্দ করিয়া, আঁাউ-আঁাউ রবে, কাল-ভৈরবীর ন্যায় তিড়ীং তিড়ীং নৃত্য করিতে লাগিল। রণভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

পতিতপাবন 'হতভম্ব'। মুখে কথা নাই, চক্ষের পলক নাই, নাসিকারও বুঝি নিশ্বাস নাই।

কালাচাঁদের অন্তরে কেবল আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত। দেহ পুলকে পূর্ণ। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"নারোদ! নারোদ!"

সমর-প্রাঙ্গণে মুহূর্ত্ত-কাল "তাথেই তাথেই" নৃত্য করিয়া হরির মা বাক্য-বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিল,—"অলো হোল্‌সা-মুখী! কটাচুলি! উট্‌কপালী! চেরন্-দাঁতী। তোকে আমি ডরাবো না লো—আমি ডরাবো না। যারা তোর সোমত্ত বয়স্ দেখে ভয় খায় লো, তাদের কাছে তুই বাক্‌চাতুরী করিস্। সে দিন দত্ত-বাড়ী মার-খেয়ে তোর যে পিঠের চামড়া উঠে গেছলো-লো!—

চূণে-হলুদ দিয়ে আরাম কল্লে কে-লো? এই, কথায় বলে,—

তিতাক তিতাক তিতাক লো!
তিন-কুড়ি-তিন তোর সোয়ামী লো!!

তাই হয়েচে তোর। তুই আবার কোন্ মুখে কথা ক'স্? ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দিবো জানিস্।

কুসুমকামিনী তখন ব্যাপার বড় গুরুতর বুঝিয়া, কালাচাঁদকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল,—"দেখুন, মোশাই! আপনাদের সমুখেই বুড়ী কত অকথা-কুকথা বল্‌চে। আপনারা ওকে থাম্‌তে বলুন,—নহিলে আমার সঙ্গে ওর ভাল হবে না—এখনি একটা কাণ্ড বেধে যাবে।"

হরির মা মুখ ভেঙাইয়া, দাঁত বাহির করিয়া, তালে তালে নাচিতে নাচিতে কুসুমের দিকে অগ্রসর হইয়া,—বলিতে লাগিল, "অলো! মার্‌বি নাকি লো!—তোর গায়ে আজকাল বেশী বল্ বেঁধেচে লো,—বল্ বেঁধেচে!—তোর দলে লোক

ঢের লো,—লোক ঢের হয়েচে!—মার্-না লো,—মার্‌না,—কাঠের সখীর মত অমন দাঁড়িয়ে রইলি কেন? অলো! মেরে হাতের সুখ করে-নে লো—হাতের সুখ করে-নে!—এমন দিন তোর আর থাক্‌বে-না লো—থাক্‌বে না!”

হরির মা এই কথা বলিতে বলিতে ক্রমশ কুসুমকামিনীর নিকটবর্ত্তিনী হইল। কুসুম, বেগতিক বুঝিয়া দুই-চারি পা পশ্চাৎ হটিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

তখন হরির মায়ের বিক্রম আরও বাড়িল। মুখখানিকে অধিকতর বিকৃত করিয়া খাঁটি বাজখাঁই সুরে আরম্ভ করিল,—“যাস্ কোথা লো—ময়না! পিঠ যে পেতে দিয়েচি লো,—তুই যদি আজ আমাকে না মারিস্, তবে তুই ভেয়ের মাথা খাস্।”

এই বলিয়া হরির মা, কুসুমের গায়ে, পিঠ ঠেকাইয়া দিল।

ইত্যবসরে, পতিতপাবন, বিষম বিভ্রাট উপস্থিত

দুই দাসীর দ্বন্দ্ব।

দেখিয়া, হাঁ—হাঁ রবে দৌড়িয়া গিয়া, তাহাদের উভয়ের সংমিলিত অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিয়া, মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন কুসুম বলিতেছেন,—“ঠাকুদ্দা! তুমি সরে যাও, পথ ছেড়ে দাও,—ও কেমন হরের মা—বেটা-খাগী!—ওকে আমি একবার বুঝ্‌বো। ওর মুখ দিয়ে রক্ত বার না ক’রে আজ জলগ্রহণ কর্‌বো না!”

এ দিকে হরির মা পতিতকে বলিতেছেন,—“তুমি সুমুখে দাঁড়ালে কেন? সরো বল্‌চি—ও নচ্ছারনী—ভাই-খাগী-আমাকে একবার মারুক্,—ওর গতরে তেজ কত,—মগজে ঘী কত,—আমি একবার দেখ্‌বো!—আরে মোর তুমি-রে! যা-নয়-তাই—ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি!”

প্রকৃতই এবার রণভুমের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। দক্ষিণে কুসুমকামিনী, বামে হরির জননী,—মধ্যভাগে শ্রীপতিতপাবন। একদিকে শেয়া-কুল, অন্যদিকে বাব্‌লা,—মধ্যস্থলে খেজুর। এক-দিকে কুক্কুরী, অন্যদিকে শৃগালী,—মধ্যস্থলে বলীবর্দ্দ।

রণভূমির শোভা যতই বৃদ্ধি পায়, পতিতের অবস্থা ততই শোচনীয় দৃষ্ট হয়। রণ-রঙ্গিণী দুইটী মাতঙ্গিনী, পতিত-পেয়ারাবৃক্ষের দুইদিক হইতে দুইটী বাহু-শাখা লইয়া আকর্ষণ, বিকর্ষণ, সম্প্রকর্ষণ করিতেছেন! আর, ঐ মাতঙ্গিনীদ্বয় যেন বৃংহিতধ্বনি করিয়া মুখে এই কথা বলিতেছেন, "একবার পথ ছাড়িয়া দাও, একবার পথ ছাড়িয়া দাও,—রণভূমে অদ্য রুধিরের নদী বহাইব।" পতিত-পেয়ারাবৃক্ষ দুইটী বাহু-শাখা লইয়া উভয়কেই আটক করিয়া থামাইতেছেন, "ক্রোধ সম্বরণ কর, ক্রোধ সম্বরণ কর,—রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

ক্রমে বাহু-শাখাদ্বয় দেহ-স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। ঘোররণে মাতঙ্গিনীদ্বয়ের বসনভূষণও শিথিল হইতে আরম্ভ হইল। রণসংঘর্ষণে কুসুমকামিনীর দক্ষিণ-হস্ত-স্থিত চুড়ি কতক ভাঙ্গিয়া ভূতলে পতিত হইল। অর্দ্ধভগ্নভাবে কতক চুড়ি হস্তে সংলগ্ন রহিল। সেই অর্দ্ধভগ্ন চুড়ির আঘাতে পতিতের কপাল দিয়া

রুধির-ধারা নির্গত হইতে লাগিল। এইরূপে এই মহাসমরে ক্রমশ পতিতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিল। পরামাণিকের প্রাণ ওষ্ঠে আসিল।

কালাচাঁদ এখনও ধীরভাবে বসিয়া আছেন। সম্মুখে যে এরূপ প্রলয়-ঝড় বহিয়া যাইতেছে, তৎপ্রতি তাঁহার যেন দৃক্পাত নাই। বোধ হয় তিনি এখনও মনে মনে মহানন্দ উপভোগ করিতেছেন। কিন্তু ইহা কি আমোদ-কৌতুকের সময়? তিনটা লোক খুনোখুনি করিতেছে, ইহা দেখিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? কালাচাঁদের এখন মজা দেখাটা—উচিত হইয়াছে কি?

উচিত হউক, আর অনুচিতই হউক—কালাচাঁদ যোদ্ধা মজাই দেখিতে লাগিলেন। ওদিকে সমর-রঙ্গ-ভঙ্গ ক্রমশই চরমমাত্রায় উঠিতে চলিল। কুসুমের কবরী খসিল, চুল এলাইয়া পড়িল, টীপ্ মুছিয়া গেল,—অধিক আর কি বলিব,—অঙ্গের বসনও বিধ্বস্ত হইল!

এদিকে হরির মাতা, বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিয়া সজোরে স্বয়ং তদুপরি চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই চটাচট্, পটাপট্, সটাসট্ শব্দে পল্লী প্রকম্পিত হইল। আর তিনি তদুপলক্ষে মুখে বুলি ধরিলেন,—"অলো কুসমী-লো!—মার্-না—মার্-না—মার্না-লো!—তুই যদি না মারিস্, তুই ভেয়ের মাথা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাস্ লো!" হরির মাতার তখন গলা ভাঙ্গিয়াছে,—কণ্ঠস্বর স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইতেছে না।

আর সে-দিকে,—অর্থাৎ পতিতপাবনের দিকে, যাহা ঘটিল, তাহা আর বলিবার উপযুক্ত নহে। সে এক বিতিকিচ্ছি বীভৎস ব্যাপার! কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়, চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয়, নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিতে হয়। সমর-সংঘর্ষণে শ্রীল শ্রীযুক্ত পতিতপাবন পরামাণিক মহাশয়ের কোমরের কাপড় খুলিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে পতিতও ভূমিতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিলেন। কুসুমকামিনী অমনি বেগে সে গৃহ হইতে নিক্রান্ত

হইলেন। হরির মাতাও কুসুমের সম্মুখীন হইবার আশায় সে গৃহ পরিত্যাগের উদ্‌যোগ করিলেন।

তখন কালাচাঁদ দৌড়িয়া গিয়া হরির মাকে আটকাইলেন; আর তাহাকে ঘরের বাহির হইতে দিলেন না। মুরুব্বি-আনা-ভাবে বুড়ীকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—“যাঃ বুড়ী বেটী! ঐ ঘরের ভিতর ব'স্‌গে যা! আর ঝগড়া করে না!”

বৃদ্ধাকে ঠেলিয়া দিয়া, কালাচাঁদ বাহির হইয়া ঘরে শিকল দিয়া রাখিলেন। সম্মুখে কুসুমকে দেখিয়া তিনি মধুর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—“কেন মা! আর, বিবাদ কর? দেখ্‌চো ত ঐ বুড়ী ভারি দুষ্ট!—তুমি ঘরে যাও।”

কুসুম তখন কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বলিল, “আপনি মোশাই! ভদ্র লোক। এর বিচার করুন,—আমার কোন দোষ আছে কি না?”

কালাচাঁদ কহিলেন,—“না।”

কুসুম তখন হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—বলিল, “ঐ বুড়ী কি না দশজনের

সাক্ষাতে আমার ভাই-কেটে গাল দেয়! নাপিত-ঠাকুদ্দা আমাকে কি না ডেকে এনে এই অপমান কল্লেন?”

কালাচাঁদ। মা! তুমি আর কেঁদো না—ঘরে যাও।

কুসুমকামিনী তখন সর্ব্বরকমে পরম আপ্যায়িত হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, গালি দিতে দিতে, গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য, হরির মাতাই ঝী-রূপে কালাচাঁদের গৃহে রহিল। পতিতপাবন অবশ্যই কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইল; তবে মুখ ফুটিয়া কালাচাঁদকে কোন কথা বলিতে পারিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রথম চেষ্টা বিফল হইল। তার পর দ্বিতীয় চেষ্টা। কালাচাঁদের গঙ্গাস্নান যাইবার পথে, কয়েক ঘর বেশ্যার বাস ছিল। পতিতের শিক্ষামত বারাঙ্গনাগণ কালাচাঁদকে দেখিয়া মুচকি হাসিত, ইশারা-ইঙ্গিত করিত, কখন বা স্পষ্ট ত বলিত, "আসুন্ না মোশাই!—এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাবেন!" কালাচাঁদ ঈষৎ হাসিয়াই সে কথা উড়াইয়া দিতেন।

একবার পতিতের ষড়যন্ত্রে বার জন বিলাসিনী গঙ্গার ঘাটে কালাচাঁদকে ঘেরাও করিয়াছিল। কালাচাঁদ বিব্রত হইয়া বলিলেন, "আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও।" প্রধানা বেশ্যা উত্তর দিল,—"যদি কথা রাখো, তবে পথ ছাড়িব।"

কালাচাঁদ। আমার সঙ্গে তোমাদের আবার কি কথা?

প্রধানা। কোন গূঢ় কথা না থাকিলে কি আর আমরা তোমার শরণ নিতে এসেচি?

কালাচাঁদ মনে মনে ভাবিলেন, "বাবা! বেশ্যা-গুলা বলে কি?—আমার আবার শরণ নিতে চায়!"

প্রধানা। কথাটী রাখ্‌বে ব'লো—তা' হলে বলি। নহিলে বেণাবনে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ কি?

কালাচাঁদ। কি কথাটাই আগে বল না কেন? রাখারাখির কথা পরে হবে।

প্রধানা। (হাসিয়া) তা হবে না,—আমাদের এক একটী কথার দামই লাখ টাকা। কথাটী শুনে নিয়ে শেষে তুমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাও—আর, আমরা ফ্যাল-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকি আর কি? বাঃ বাঃ মজা বেশ! আগে তুমি গঙ্গা-সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বীকার কর যে, নিশ্চয় আমাদের কথা রক্ষা করিবে,—তবে ত আমরা সে কথা বলিব!

কালাচাঁদ। আমি এত সাত-সতের কাণ্ড

করিতে, প্রতিজ্ঞা করিতে, গঙ্গাজলি করিতে পারিব না। তোমাদের ইচ্ছা না হয়,—সে কথা আমাকে বলিয়া কাজ নাই। তার পর, তোমরাও ঘরে যাও, আমিও ঘরে যাই। স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে এমনভাবে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিব?

প্রধানা। কাপড় তোমার ভিজেই হউক, শুক্‌নাই হউক,—পথ আমরা কিছুতেই ছাড়িতেছি না। আমরা এই তোমাকে ঘেরিয়া রহিলাম,—তোমার শক্তি থাকে, আমাদিগকে ভেদ করিয়া যাও।

কালাচাঁদ মনে করিলেন, "এ পর্য্যন্ত এমন বিপদে ত কখনও পড়ি নাই। এমন অঘটন ঘটনাও ত কখন দেখি নাই। হুগলীটা বড়ই বিশ্রী সহর। এখানে মেয়ে মানুষে পুরুষের মাথায় চড়ে বেড়ায়!—এই মেয়েগুলাকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া ভেদ করিয়াই বা যাই কিরূপে? যদি একটা মেয়েকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া যাইতে চাই,—আর যদি বাকী এগারটী মেয়ে

আমার ঘাড়ে পড়িয়া আমাকে আটকাইবার চেষ্টা করে,—তখন ত একটা বিপরীত-ব্যাপার ঘটিয়া উঠিবে। মেয়েগুলার সঙ্গে ধরাধরি, হুটাপাটি, পাছড়া-পাছড়ি, বাধিয়া যাইবে। হয় ত আমার দারুণ আঘাতে কোন মেয়েটার হাত ভাঙ্গিবে, নাক দিয়া মুখ দিয়া, রক্ত পড়িবে, কাহারও বা চুল এলাইয়া ছিন্নভিন্ন হইবে,—এমন কি, কেহ বা বিবস্ত্রাও হইতে পারে। এখন, এই বেশ্যাগুলার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় কি?—আচ্ছা, ইহাদের সেই গূঢ় কথাটাই কি,—তাহা শুনা যাক্ না কেন?—তার পর যা হয় হ'বে। প্রথমত একটা কৌশল করা যাক্।”

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ বলিলেন, “আচ্ছা, আমি তোমাদের কথা রাখিব,—প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কিন্তু তোমাদিগকেও আমার নিকট এক সত্য করিতে হইবে—”

প্রধানা। আমরা সকলেই রাজী আছি। তোমার কথা শুন্‌বো,—এ কোন্ বড় কথা? তুমি

বার-নারী বেষ্টিত কালাচাঁদ।

হ'লে আজ আমাদের ইষ্টদেবতা!—তুমি যা বলিবে, তাই করিব।

কালাচাঁদ। এইবার তবে তোমাদের সেই গূঢ় কথা বল।

প্রধানা। অদ্য রাস-পূর্ণিমা। আমরা একটী কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। তোমাকে সেই পদে বরণ করিলাম। অদ্য রাসলীলায় তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ সাজিতে হইবে।

কালাচাঁদের শরীর দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। বাজারের বেশ্যাগুলা বলে কি? ইহাদের এত সাহস বাড়িল কিসে? আমার সঙ্গে আলাপ নাই, চাক্ষুষ কথাবার্ত্তা নাই, পরিচয় নাই, ইহারা পথে যাইতে আমাকে দেখে এই মাত্র—তথাচ ইহাদের এত আস্পর্দ্ধা হইল কিরূপে? অবশ্যই ইহারা কাহারও নিকট হইতে সাহস পাইয়া, আমাকে এরূপ-ভাবে বেষ্টন করিয়াছে। বোধ হয়, বন্ধু পতিতপাবনেরই এই কাজ। যাহাই হউক,—উদ্ধারের এখন উপায় কি? ইহারা যদি বারজন স্ত্রীলোক না হইয়া,

বারজন মল্ল-বেশধারী অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত দস্যু হইত,—তাহা হইলে আমি এত ভয় করিতাম না।—এত কেন, ইহার সিকির সিকি ভয়ও করিতাম না। এখন মেয়ে-মানুষের গায়ে হাত তুলিব কেমন করিয়া?—শুধু হাত তোলা নয়,—প্রকৃত-প্রস্তাবে মল্ল-যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইবে। তাহাই বা কেমন করিয়া করি? বিষম লেঠা দেখিতেছি। যা'হোক,—এখন কথা কাটাকাটিই খানিক চলুক,—ভবিষ্যতে অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে।

তখন কালাচাঁদ ধীরভাবে বেশ্যাগণকে বলিবেন, "আমি আমার প্রতিজ্ঞামত নিশ্চয়ই কৃষ্ণ সাজিতেছি। কিন্তু তোমরা এখন তোমাদের সত্য রক্ষা কর।"

প্রধানা। প্রভুর যা আজ্ঞা হয়, এ দাসীগণ এখনি তাই করিতে সম্মত।

কালাচাঁদ। আমার কথা এই,—'তোমরা পথ ছাড়িয়া দাও, আমি ঘর যাইব।'

তখন বেশ্যামণ্ডলী হইতে একটা কল-কল-

হল-হল ধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু প্রধানা নায়িকা, সকলকে থামাইয়া কালাচাঁদের উদ্দেশে যোড়হাতে বলিল, "তুমি কি ফাঁকি দিয়ে পালাবে হে শ্যাম?—তুমি কি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাবে হে?—তা'ত হবে না!—পলাতে ত দিব না! আমরা প্রেমডোরে বেঁধে তোমায়, হৃদি-কারাগারে রাখ্‌ব বার মাস।"

এ কথা শুনিয়া কালাচাঁদের পায়ের নখের মুড়ি হইতে মাথার চুলের ডগ পর্য্যন্ত একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি একটা বিভীষণ হুঙ্কার ছাড়িয়া উর্দ্ধে যেন দশহাত লাফাইয়া উঠিলেন।

তার পর কি ঘটনা ঘটিল, তাহার প্রকৃত ইতিহাস নাই। পতিত বলেন,—"কালাচাঁদ কয়েক জন বেশ্যা দেখিয়া, ভয়ে, গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন,—শেষে সাঁতার কাটিয়া, গঙ্গা পার হইয়া গরিফায় গিয়া আশ্রয় লন।" কালাচাঁদ বলেন, "আমি লাফাইয়া বীর-পুরুষের ন্যায় চলিয়া

আসি,—বেশ্যারা আমার গামছা-খানি ধরে,—তা, গামছা-খানি তাহাদের হাতেই থাকিয়া যায়।” সে যাহা হউক—এ প্রসঙ্গ লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে।

পতিতপাবনের সব আশাই অন্তর্হিত হইল। কালাচাঁদ, কামিনীর মোহিনী মায়ায় ভুলিলেন না, কাম-ফাঁদে পড়িলেন না। পতিতের দুঃখের অবধি রহিল না।
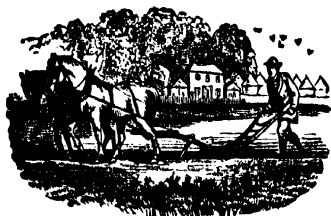
দশম পরিচ্ছেদ।

কারাবাসের পূর্ব্বে, কালাচাঁদ মদ, ভাঙ্গ, গাঁজা, আফিং, চরস, চণ্ডু, সিদ্ধি, তামাক—সব কয়টা নেশাই যথানিয়মে করিয়াছিলেন। তবে সুবিধার মধ্যে এই ছিল,—তিনি কোন নেশারই অধীন হইয়া পড়েন নাই। যখন যে মাদক-দ্রব্যটা সম্মুখে পাইতেন, তখন তাহাই সেবন করিতেন। দশদিন কোন নেশা করিতে পারিলেন না,—তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই। তামাকটা কিন্তু প্রায় অষ্ট-প্রহরই আবশ্যক হইত।

কারাগারেও কালাচাঁদের কিছু-কিছু নেশার কার্য্য চলিয়াছিল। কারামুক্তির পর কালাচাঁদ সব নেশাই এককালে ছাড়িয়া দিলেন;—কেবল কয়েক দিনমাত্র গাঁজা এক-আধ-ছিলিম খাইতেন। শেষে তাহাও তিনি পরিত্যাগ করিলেন। রহিল কেবল, গুড়ুক-তামাক,—সেটা যেন সঙ্গের সাথী।

কালাচাঁদের গাঁজা-ত্যাগের কথা শুনিয়া, পতিত-

পাবনের ডাক-ছাড়িয়া কান্না পাইল। শতপুত্রের শোক পতিত ভুলিতে পারে,—কিন্তু কালাচাঁদের গাঁজাত্যাগের কথা ভুলিবার নহে। হে গাঁজে! তুমি ত্বরিতানন্দ! তোমার মহিমায় মুহূর্ত্তমধ্যে করতলে স্বর্গ পাই। তুমি আছ বলিয়াই, এ-সংসার, মরুভূমি হইয়াও, ফুল্লকমলদলপূর্ণ কেলীকুঞ্জবন। তোমার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইয়া, পথশ্রান্ত পথিক সর্ব্বকষ্ট ভুলিয়া যায়। তোমার সাহায্যে, ব্যোমযান-ব্যতীত, আকাশপথে উড়িতে পারি। তোমারই সাহায্যে, বাষ্পীয়-শকট-ব্যতীতও, অল্পসময় মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ-ভ্রমণে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম! তুমি যখন দেহে বাস কর, তখন ক্ষুধা থাকে না, তৃষ্ণা থাকে না, বাসনা থাকে না ;—শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-পুরুষের ন্যায়, আত্মারাম হইয়া কেবল এক অক্ষয়, অদ্বিতীয়, অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ উপভোগ করি। তখন কেবল মনে হয়,—

আমি কার, কে আমার
কারে ভাবিরে আপন।

এ-হেন গঞ্জিকা-বিহনে পরামাণিকের কান্নাই ত আসিতে পারে। কান্না ত সামান্য কথা,—নিদারুণ-যন্ত্রণায় পতিতের দেহ যে, চৌষট্টি-খণ্ডে বিভক্ত হয় নাই,—ইহাই আশ্চর্য্য। পতিত, প্রকৃত বীর-পুরুষ বলিয়াই, এ দুরন্ত দৈব-বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; অন্য কোন সামান্য মানব হইলে, সেই দিনই তাহার অপমৃত্যু ঘটিত।

অভিমান ভরে পতিত গোটা একদিন-কাল কালাচাঁদের সহিত কথা কহে নাই। কিন্তু কালাচাঁদ যে, পরামাণিকের প্রাণের বন্ধু;—কথা না কহিয়া কতক্ষণ তিষ্ঠিবে?

পরদিন প্রাতে তামাক খাইতে খাইতে পতিত খুব গম্ভীর স্বরে কালাচাঁদকে বলিল;—"বন্ধু! তুমি কাজটা ভাল কর নাই। বড়ই কু-কাজ হইয়াছে।"

কালাচাঁদ ব্যাপার তত তলাইয়া বুঝেন নাই—একটু চম্‌কাইয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"এঁ,—আমি এমন কি খারাপ কাজ করিয়াছি?—কিছুই ত মনে হয় না!!"

পতিত। আমি একা নই,—পাড়ার সকলেই বলিতেছে,—অতি মন্দ কাজ হইয়াছে। আমার নিজের জন্য বলি নাই;—বন্ধু! তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই বলিতেছি।

কালাচাঁদ। বলই-না শুনি,—মন্দ কাজটা কি ?

পতিত। এই, এখানকার জল একরকম,—সেখানকার জল একরকম;—এখানকার খাওয়া একরকম, সেখানকার খাওয়া একরকম! তা, সহ্য হবে কেন? শেষে একটা ঘোরতর কাণ্ড উপস্থিত হবে দেখ্‌চি!

কালাচাঁদ। অত ভূমিকায় কাজ কি?—খুলেই বল না,—কি হয়েচে?

পতিত। তোমাকে আর সে সব কথা বলেই বা কি হবে?—তুমি কি বুঝালে, বুঝ যে,—বুঝাব? তখন এক দিন-কাল ছিল,—পতিত যা বল্‌তো, তাই হ'তো। এখন পতিতকে মানে কে? পতিতের কথা শুনে কে? বন্ধু! তোমারই

ভালোর জন্য বলি। এতে আমার কিছু স্বার্থ নাই!

কালাচাঁদ। আঃ,—কি তোমার কথা আছে, সোজা-সুজি বল্‌বে ত বল!—নহিলে আমি এখনি উঠে চল্লেম। ধান্‌ভান্‌তে আমি এত শিবের গীত শুন্‌তে পারি না।

পতিত। তা, পতিতের কথা এখন শিবের গীত হবে বৈ কি? পতিতকে এখন বেঙেও লাথী মেরে যায়! কিন্তু পতিত যা বলে, তাই ফলে। পতিত বলেছিল, বাঁড়ুয্যেদের নারকেল গাছে বাজ্ পড়্‌বে, তা, এক মাস সইলো না, গাছে বাজ্ পড়্‌লো!

কালাচাঁদ মনে মনে হাসিলেন। বাহ্যিক গম্ভীর-ভাব দেখাইয়া, মিষ্ট বাক্যে কহিলেন,—"বন্ধু! তুমি রাগ কর কেন? আমি তোমার কোন্ কথা শুনি নাই?—তুমি কোন একটা কথা বলিলে, তাহা কি আমি না শুনিতে পারি?"

পতিতের মন একটু প্রসন্ন হইল। বলিল,—

"তোমাকে আমি পর ভাবি না। বন্ধু! তোমার উপর কেমন যে একটা ঝোঁক্ পড়েচে, তা, তোমার 'ভালাই' আমাকে আট-পহরই ভাব্‌তে হয়। এই হুগলী-সহরটা এক পক্ষে বেশ ভাল হ'লেও, অন্য পক্ষে বড় খারাপ। বন্ধু! দেখ্‌চো না, এখানে অধিকাংশ লোকেরই পায়ে গোদ, গলায় গলগণ্ড, হাতে ফুলো! কেন এমন হয়?—এখানকার জলে একটা দোষ আছে।"

কালাচাঁদ। জলে দোষ থাক্‌লে ত, আমার এতদিন গোদ, গলগণ্ড—সবই হ'তো। বন্ধু! তুমি জানো ত,—দু-ঘণ্টার কম আমার স্নান হয় না—অন্তত এক শ ডুবের কম আমার তৃপ্তি হয় না,—ডুব-সাঁতার-কেটে অন্তত একবার মাঝ-গঙ্গায় না গেলে আমার পূর্ণ-স্নান হয় না,—এ সবই ত তুমি জানো;—তবে কেন তুমি বল্‌চো,—এখানকার জলে দোষ আছে? জলে যদি কোন দোষ থাক্‌তো, তা হলে আমি আর এতদিন বাঁচতাম না।

পতিতপাবন এইবার তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের ন্যায়

ওস্তাদিধরণে খুব খানিক হাসিয়া বলিল,—"বন্ধু! তুমি এতদিন ভাল ছিলে বটে, কিন্তু এখন তুমি আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছ।"

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) আমার ঘরে কুড়ুলই নাই,—তা, আবার পায়ে চোটাব কেমন করে?

পতিত। বন্ধু! আমি তোমাকে তামাসা কর্‌চি না,—

কালাচাঁদ। তা, আমি কি দোষটা করেচি,—চোক-কাণ বুজে তাই বলেই ফেল না কেন?

পতিত। আচ্ছা, একটা কথা আগে তুমি বল;—এ তুদিন তোমার খিদে হচ্চে কেমন? প্রাতে চোঁয়া ঢৈ-ঢেঁকুর মারে কি না? সন্ধ্যার পর হাই উঠে কিনা? শরীরটা কেমন ঝিম্‌-ঝিম্ করে কিনা?

কালাচাঁদ এইবার পতিতের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া, মনে-মনে অনন্ত-হাসি হাসিয়া, উদর পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। খানিক হাসি, উদর উপ্‌ছাইয়া, মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কালাচাঁদ উত্তর দিলেন, "এ তুদিন ক্ষুধা কম

হওয়া দূরে যাউক, বরং বৃদ্ধিই রাখিয়াছে। বেলা দুইপ্রহরে ভাত খাইলাম,—আবার দুইটা না-বাজিতে-বাজিতেই ক্ষুধার আরম্ভ। শেষ-রাত্রে উঠিয়া আবার ক্ষুধা। "হাই"—কখন্ উঠে তা'ত কিছুই জানি না।—

পতিত। পিদিম্‌টা নিবিবার পূর্ব্বে একবার খুব জ্বলে উঠে বটে!—ওটা খিদে নয়—দিষ্টি-খিদে!—আর দু-চার দিন বাদে, বন্ধু! তুমি আমার কথা জান্‌তে পার্‌বে!

কালাচাঁদ। দু-চার দিন পরে আমার কি রোগ হবে,—তা, আমি এখন থেকে কেমন ক'রে জান্‌বো—

পতিত। জান্‌তে হয়!—সংসারে থাক্‌তে হ'লেই, জান্‌তে হয়;—

কালাচাঁদ। আমি ত কিছু জান্‌তে-টান্‌তে পার্‌চি না,—তুমি কিছু জেনে থাক,—বলে দাও।

পতিত। বলাবলিই আর কি আছে?—তুমি ত কারু কথা শুন্‌বে না—বলেই বা কি ফল আছে?

তবে তোমার কষ্ট দেখ্‌তে পারি না—তাই বল্‌তে হয়।

দুঃখমিশ্রিত ক্রোধভরে পতিতপাবনের অবস্থান।

কালাচাঁদ। বন্ধু! তুমি বলো,—বলো!

পতিত। এই, তর্‌শু থেকে তুমি একেবারে তামাক খাওয়াটা উঠিয়ে দিলে!—তা, আমি একজন ঘরে রয়েচি, আমাকে ত একবার জিজ্ঞেস্ কর্‌লেও হতো! আমি দেখ্‌চি;—তুমি আপন মনে কাজ কর্‌চো—আমি সে সময় বাধা দিব কেন?—আমি মজা দেখ্‌চি,—এখন ও কর্‌চে করুক;—এই দু-দিন পরে, শেষে আমার কাছে গুড়িয়ে আস্‌তে হ'বে! তখন পতিতকে না-হ'লে কারু চলবে না! তবে কি না,—বন্ধু! তোমার সঙ্গে আমার বড়ই ভালবাসাটা হয়েচে,—তাই এ কথা আজ না ব'লে থাকৃতে পার্‌লাম না।

হাস্যরস-ময় কালাচাঁদ দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া বলিলেন,—"বন্ধু! আমি কি সাধ ক'রে 'বড়-তামাকৃটা' একবারে ছেড়ে দিয়েচি? এর ভিতর

অনেক গোপনীয় কথা আছে! আমার বিছানার উপর একদিন একটা জবাফুল পড়েছিল, তাহা কি তুমি দেখেছিলে?"

পতিত। দেখি নাই,—ঝীয়ের মুখে শুনে-ছিলাম বটে।

কালাচাঁদ তখন কথার সুর নরম করিলেন,—বলিলেন, "সে'ত ফুল নয়,—মা-কালীর অনুগ্রহ।"

কালাচাঁদ আর কথা না কহিয়া, পতিতের কাণে কাণে কি কথা বলিলেন।

পতিত শিহরিয়া উঠিল। তাহার নয়নদ্বয় বিস্তৃত হইল। মুখটা 'হাঁ' হইয়া গেল। পতিত বলিল, "বল কি, বন্ধু! বল কি?"

কালাচাঁদ। এর্ সবটাই সত্য। তাই 'তামাক' ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

পতিত প্রকৃতিস্থ হইয়া, খানিক ভাবিয়া বলিল, "মা-কালীর আজ্ঞে, অবিশ্যি লঙ্ঘন করিতে নেই;—কিন্তু কথক-ঠাকুর সে-দিন বলেছিলেন, শরীরটে আগে, ধর্ম্মটা পরে।"

কালাচাঁদ। কি কর্‌বো বল, বন্ধু!—শরীর রক্ষা করিতে গেলে, মা-কালীর আজ্ঞে লঙ্ঘন করিতে হয়। কাজেই তামাকটা ত্যাগ করিতে হইল।

পতিত আর কোন কথা কহিল না। ত্বরায় তথা হইতে উঠিয়া গেল। ঘরেও আর তিষ্ঠিল না। 'ভাঁড়' বগলে করিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল। আপন-মনে যদৃচ্ছাক্রমে যাইতে যাইতে বোধ হয় এই ভাবিল,—"কালাচাঁদ ত গাঁজাটা ছাড়িয়া দিল। এর পর যদি মাছটা ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে এ সংসারে থাকাই বৃথা!"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রমণী এবং গঞ্জিকা উভয়ই কালাচাঁদ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল,—তথাচ পতিতপাবন ক্ষান্ত নাই। কালাচাঁদ কিসে মদিরা-সুধায় আসক্ত হন,—তাহাই তখন তাহার ভাবনার বিষয় হইল। কালাচাঁদের যদি কোন দিন সর্দ্দি করে, পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" গ্রীষ্মে যদি কালাচাঁদের ঘাম ঝরে, পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" বসন্তে যদি মলয় বায়ু বহে, পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" যে দিন আমোদ-প্রমোদ-সঙ্গীত হয়, সে দিন পতিত উপদেশ দেয়, -"বন্ধু! একটু মদ খাও।" যে দিন কোন কারণে শোক-দুঃখ ঘটে, সে দিনও পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" যে দিন বর্ষা-বাদলে বাটীতে চাল-কড়াই-ভাজা হয়, পতিত সে দিনও

উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" কালাচাঁদ কিন্তু কিছুতেই মদ খাইলেন না।

পতিত এক এক দিন, কালাচাঁদের সম্মুখে, অন্যের সহিত, সুরা-বিষয়ে বিচার করিতে বসিত। পতিত বলিত,—"মদে কোন দোষ নাই, তবে অধিক মাত্রায় খাইলেই দোষ। মদ মহৌষধ-স্বরূপ। জ্বর-বিকার হইয়াছে;—ঔষধ মদ। পাঁচ-ক্রোশ পথ চলিয়া পা-দুটী অসাড় হইয়াছে;—ঔষধ মদ। কেহ পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়াছে,—ঔষধ মদ। মদ অতি মূল্যবান্ সামগ্রী,—উহা যেরূপ উচ্চ-অঙ্গের জিনিস, তাহাতে উহার দাম আরও অধিক হওয়া উচিত। তবে মাত্রা অধিক হইলে, মদে দোষ ঘটে। তা, মাত্রা অধিক হইলে, কোন্ জিনিস্‌টায় দোষ না ঘটে? সন্দেস অতি উপাদেয় বস্তু। খুব বেশী খাও, পেট ফাঁপিবে,—আরও খুব বেশী খাও, পেট ফাটিয়া যাইবে। সেইরূপ মদে কোন দোষ নাই, মাত্রায় কেবল দোষ আছে। মদে কোন দোষত নাইই,

অধিকন্তু মদ সুপবিত্র। মদ দেবতার ভোগে লাগে। মদ মা-কালীর প্রসাদ! মদ যদি অপবিত্র অশুদ্ধ, হেয় দ্রব্য হইত, তাহা হইলে মা-কালী উহা তাঁহার পানীয় বলিয়া গ্রহণ করিবেন কেন? সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখ, মদে কোন দোষ নাই।”

এত বিচার বিতর্ক শুনিয়াও, কালাচাঁদ মদ ধরিলেন না। পতিতের দুর্ভাবনার সীমা রহিল না। পতিতের ইচ্ছা হইল, কালাচাঁদের যদি একবার জ্বর-বিকার হয়, তাহা হইলে উহাকে মনের সাধে মদ খাওয়াই। কিন্তু জ্বর-বিকারত কাহারও হাত-ধরা নয়! পতিত ভাবিল, কালাচাঁদ যদি একবার দড়াম্ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায়,—হাতে-পায়ে-গায়ে খুব ব্যথা লাগে,—তাহা হইলে বন্ধুকে মদ খাওয়াইবার খুব সুবিধা হইবে। তখন আর কাহারও কথা শুনিব না,—একেবারে জোর করিয়া মুখে মদ ঢালিয়া দিব। কিন্তু কালাচাঁদ পড়েন কিরূপে?

ভাবিতে ভাবিতে পতিতের মনোমধ্যে এক সুযুক্তির কথা উদিত হইল।—“কালাচাঁদ খুব ভোরে উঠিয়া বেড়াইতে যায়। আমি খানিক তেল ফেলিয়া পৈঠা পিছল করিয়া রাখি। যাই সে, পৈঠায় পা-টী বাড়াইয়া দিবে, অমনি চীৎপাত হইয়া পড়িয়া যাইবে।”

এইরূপ কল্পনা করিয়া, পতিত একসের সরিষার তৈল কিনিয়া আনিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে উঠিয়া পৈঠায় আচ্ছা করিয়া তেল ঢালিয়া দিল। স্বয়ং পতিত, কালাচাঁদের পতন দেখিবার জন্য, জানেলায় মুখটী দিয়া, জাগিয়া বসিয়া রহিল।

কালাচাঁদ প্রভাতে যথানিয়মে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। যথানিয়মে দূপ করিয়া দোয়ার হইতে উঠানে লাফাইয়া পড়িলেন। কালাচাঁদ প্রাতে অন্যের অগোচরে, প্রায়ই লাফ মারিয়াই ভূমিতে অবতরণ করেন। এ সংবাদ পতিত জানিত না। তাই সে, পৈঠায় ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কালাচাঁদের লক্ষে,

"দূপ্" ইত্যাকার শব্দ হওয়ায়, পতিত নিশ্চয় করিল, বন্ধু অবশ্যই পড়িয়াছে।

তখন পতিত আস্তে-ব্যস্তে এইরূপ হাঁকাহাঁকি করিতে করিতে দৌড়িল,—"কি হে বন্ধু! কি হে বন্ধু!—প'ড়ে গেলে না-কি? আহা-হাঃ—ভারি লেগেচে, ভারি লেগেচে!"

পতিতের অদ্য হঠাৎ এই কাণ্ড দেখিয়া কালাচাঁদ কিছু চমকিত হইলেন। প্রথমত তিনি কোন কথা কহিলেন না।

পতিত স্থির করিলেন,—বন্ধু তবে পড়িয়া মূর্চ্ছা গিয়াছে;—তাই কথা কহিতেছে না।

পতিত উচ্চরবে মূর্চ্ছিত বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া আপ্যায়িত করিলেন,—"যাচ্চি, বন্ধু!—যাচ্চি!—কোন ভয় নেই! আমি একেবারে বড় ঔষধের যোগাড় ক'রে নিয়ে যাচ্চি! একটু থামো,—বন্ধু! এই তাকে একপোয়া মায়ের প্রসাদ আছে,—তাই নিয়ে যেয়ে খাওয়ালে, তবে তোমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গবে।"

এখনও কালাচাঁদের কথা নাই। তিনি স্থির-বুদ্ধিতে ভাবিতে লাগিলেন,—"আজিকার কাণ্ডখানা কি? প্রিয় বন্ধুটী আজ এমন করে কেন?" কালী-মায়ের প্রসাদের কথা শুনিয়া তাঁহার কতক চমক ভাঙ্গিল। "তবে কি পতিত আজ রাত্রি জাগিয়া আমার পতন প্রতীক্ষা করিতেছিল? 'পড়িলেই গায়ে ব্যথা!—অতএব মদ খাও।'—বন্ধু ত এইরূপ কৌশল-জাল পাতে নাই! আমার পড়িবার জন্য পতিত'ত কোনরূপ কল-কৌশল করে নাই?—ঐ পৈঁঠায় জল কেন? পাকা কলার ছোবা কেন? কলাপাতার নীচে মটরকলাই কেন? উহা ত জল নয়!—তেল যে।"

কালাচাঁদের মুখে আর হাসি ধরে না। পতিত যখন তাক্ হইতে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ-কার্য্যে ব্যস্ত ছিল,—কালাচাঁদ তখন—সেই অবকাশে,—নিঃশব্দে দীর্ঘ-দীর্ঘ পা ফেলিয়া, বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন। দ্রুতপদে একেবারে পাড়া ছাড়াইয়া, গঙ্গার ধার ধরিয়া, চঁচুড়ায় গিয়া উপনীত হইলেন।

এ দিকে পতিত-পাবন ঔষধ-পত্র লইয়া আসিয়া দেখে,—রোগী নাই। পতিত চিন্তা-যুক্ত হইল,—রোগী পলাইল কোথা? এই ভোরবেলা মূর্চ্ছিত কালাচাঁদকে 'নিশিতে' ডাকিয়া লইয়া যায় নাই ত? ঘরে বসিয়া থাকা উচিত নহে,—বন্ধুকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। পতিতও চাদর কাঁধে ফেলিয়া, বগলে গামছা-ঢাকা মহৌষধ লইয়া, বন্ধু-অন্বেষণে বহির্গত হইল। পথে যাহাকে পায়, তাহাকেই জিজ্ঞাসে,—"কেহ কি আমার বন্ধুকে দেখেচো।" অনেকে বলিল, "কালাচাঁদকে এই পথেই যাইতে দেখিয়াছি।" বেলা নয়টা পর্য্যন্ত পতিত সমস্ত হুগলী-সহরটা ঘুরিয়া-ঘুরিয়া, বন্ধুকে না পাইয়া, শুষ্কমুখে ঘরে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই দেখিল, কালাচাঁদ স্বয়ং একটা দশসের রুইমাছ কুটিতেছেন। পতিত দেখিয়াই, চমকিয়া উঠিয়া ভাবিল,—"ভূত নাকি?"

কালাচাঁদ স্ফূর্ত্তির সহিত হাস্যমুখে পতিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বন্ধু! আজ কালিয়ে-

পোলাও হবে! পূজারি-ঠাকুর এসে রাঁধ্‌বেন বলেচেন। আজ দেখ্‌বো,—তুমি কত খেতে পারো!

কালাচাঁদকে ব্যথা-শূন্য এবং অক্ষত-দেহ দেখিয়া,—প্রফুল্লমনে মৎস্য-কর্ত্তন-কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া, পতিতের প্রকৃতই রাগ হইল। বলিল,—"আমাকে না বলে, না কয়ে,—আজই তুমি এত বড় মাছটা কিন্‌লে কেন? আজ রবিবার—আজ কি মাছ খেতে আছে?

কালাচাঁদ। আজ রবি নয়,—সোমবার।

পতিত। আচ্ছা, না হয় সোমবারই হলো। আমি যদি বাবা তারকনাথের 'সোমবার' আজ থেকেই কত্তে আরম্ভ করি,—তা'হলে ত সব নষ্ট হবে। আমাকে আগে জিজ্ঞেস্ করে—তবে এ সব কাজ আরম্ভ কত্তে হয়!

কালাচাঁদ। জিজ্ঞাসা করিবার সময় পাইলাম কৈ? কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, কে যেন এক কেঁড়ে তেল কিনে এনে পৈঠেয় মাখিয়ে রেখেচে।

আমি না জেনে, পৈঁঠে দিয়ে নাব্‌তে গেছি। অমনি পা পিছলে পড়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে গেল। বাঁচ্‌বার আর উপায় ছিল না। স্বপ্নে কালী মা বল্লেন,—তুই পাড়ার সমস্ত লোক্‌কে যদি কালিয়া-পোলাও খাওয়াস্, তবে তোর এই ব্যথা আরাম হবে। এমন সময় আমার ঘুমটী ভেঙ্গে গেল। দেখিলাম, ভোর হইয়াছে। অমনি দূপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িয়া গিয়া, মল্লিক-কাসেমের হাট হইতে এই মাছটী কিনে এনেচি। বন্ধু! এতে আর আমার অপরাধ কি?

পতিত। তবে কি তেল আমি ফেলেচি নাকি? যে তেল ফেলেচে, তার সর্ব্বনাশ হো'ক! তিনদিন পেরুবে না—সে মরুক্! তার মুখের গ্রাস উড়ে যাক্।

কালাচাঁদ। বন্ধু! তুমি অমন কর্‌চো কেন?—তোমাকে ত আমি কিছুই বলি নাই।

পতিত। বলতে আর বাকি কি রহিল? এ যে ঝীকে মেরে বৌকে শেখান হ'লো,—এ কি কেউ

আর বুঝ্‌তে পারে না? পতিত জানে সব, বুঝে সব,—তবে পতিত 'মরেচে, কথা কইতে নেই,'—এই যা পতিতের দোষ। যত দোষ, নন্দঘোষ। যে যা করুক্, দোষ হবে পতিতের। পতিত আর বেশী-দিন সংসারে থাক্‌বে না,—শীঘ্রই বিবাগী হয়ে, কাশী-বিন্দাবন চলে যাবে। আর এ দেশে আস্‌বে না। বন্ধু! এ বাড়ীত তোমাকেই দান করেচি,—তুমিই ইহা ভোগ-দখল ক'রো।

কালাচাঁদ তখন কার্য্যগতি বুঝিয়া, হাসিয়া উঠিয়া, পতিতের হাত ধরিলেন। বলিলেন, "বন্ধু! আমার উপর কি তোমার রাগ করিতে আছে? এস,—ব'স।"

পতিত বসিলে, কালাচাঁদ তাহাকে স্বয়ং সাজিয়া একছিলিম গয়ার তামাক খাওয়াইলেন। তাম্রকূট-ধূমে দেহ পরিশুদ্ধ এবং প্রফুল্লিত হইলে, কালাচাঁদ পতিতের হাতে ৪৲ চারিটী টাকা দিয়া বলিলেন, "বন্ধু। পোলায়ের জন্য চাল, ঘি, মসলা, কিনে নিয়ে আস্‌তে হবে।"

পতিত টাকা চারিটী লইয়া ট্যাকে রাখিল। মনে মনে সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু মুখে একটু কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিল,—"পতিত এখন বাজার কত্তে পাল্লে হয়! হুঁ—হুঁ!—বন্ধু! তুমি এই যে, মাছটী নিজে কিনে নিয়ে এসেচো, এটী যদি আমার হাত দিয়ে কিন্‌তে, তা'হলে নিশ্চয়ই ১৲ এক টাকা সস্তা হ'তো। পাঁচগণ্ডা পয়সা—দস্তুরিই কেটে নিতেম! আর, তুমি কি মাছ চেনো? এ যে পশ্চিমে মাছ! এর যে ভাল সোয়াদ হবে না! ভারি ঠকিয়েচে! হাঃ হাঃ!—তোমার পয়সা সস্তা,—যা-ইচ্ছা তাই কর;—তবে নিতান্ত অন্যায়-গুলা দেখতে পারি না, তাই দু-কথা বলি! আমার চুপই আচ্ছা! কি জান, বন্ধু! পুকুরের দিশি-মাছ কেন্‌বার দরকার হ'লে, হাটে-বাজারে যেতে নেই! আগে জেলেবাড়ী যেতে হয়। গিয়ে, জেলেনীর সঙ্গে পরামোশ কত্তে হয়। সেই জেলের মেয়েকে মিষ্টি ক'রে দু-কথা বুঝিয়ে বল্লে, মাছটীও ভাল হয়, দু-পয়সা সস্তায়ও পাওয়া যায়।—"

কালাচাঁদ। এই হুগলী সহরে যার-ই মাছের দরকার হচ্চে, সে-ই কি অম্‌নি জেলেবাড়ী যেয়ে জেলেনীর সঙ্গে মিষ্টি কথা কচ্চে?

পতিত। বন্ধু! তোমাকে কথায় কেউ পার্‌বে না!

এই কথা কহিয়া পতিত বাহুনাড়া দিয়া বাজার করিতে চলিল। বহু-বিলম্বে বাজার হইতে ফিরিল। জিনিস-পত্র রাখিয়া, কালাচাঁদকে বলিতে লাগিল,—"গেলাম, মো'লাম,—উঃ, আর বাঁচিনা; বেলা তিতীয় পহর হইল, মুখে জল দিই নাই! বন্ধু! তোমার জন্য খেটে খেট গেলাম।"

বাজার করায় যতই কষ্ট হউক, সে দিন পতিত পরিতোষরূপে আহার অর্থ, এবং আনন্দ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক। শুষ্ক-মূল ছাড়িয়া পাতায় জল সেচনে ফল কি?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পতিতপাবন সর্ব্বপ্রকারে বিফল-মনোরথ হইল। অবশেষে অগত্যা কালাচাঁদকে একরকম ছাড়িয়াই দিল। মনে মনে ভাবিল, "কালাচাঁদকে সংশোধন করিবার আর উপায় দেখি না। লোকটা একবারে খারাপ হইয়া, বহিয়া গিয়াছে। নূতন ব্যক্তিকে লওয়ান সহজ; কিন্তু কালাচাঁদ বকেয়া-ঘাগী—উহাকে বশ করা বড়ই বিষম। কালাচাঁদ পুরাণ-পাপী,—ভুক্তভোগী—সিদ্ধ-পুরুষ। বাঁশ পাকিয়া ঝনঝনে হইয়াছে,—উহাকে কি আর এখন নোয়ান যায়?"

পতিত, কালাচাঁদ সম্বন্ধে নির্ভরসা হইল বটে, কিন্তু আশা ছাড়িতে পারিল না। আশা,—বড়ই দুষ্টা,—মায়াবিনী। এই, এবেলা ছাড়িয়া দেয়, আবার ওবেলা গ্রহণ করে। পতিত ভাবে, "এত লোকের বড় বড় রোগ আরাম হইল,—কালাচাঁদের

কি এ রোগ আরাম হইবে না? এত ভাল ভাল ঔষধ দিলাম, কিন্তু কিছুতেই ত ফল হইল না। দোষটা ঔষধের কি?”

পতিত এইরূপ ভাবে, আর থাকে। কালাচাঁদও অন্যরূপ ভাবেন, আর, পতিতের গৃহে অবস্থিতি করেন।

কালাচাঁদ কারাগার হইতে যে টাকাগুলি আনিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশ ফুরাইতে লাগিল। আয় নাই, কেবল ব্যয়;—সঞ্চিত অর্থ কতক্ষণ টিকে? এক কলসী-জল,—গড়াইতে-গড়াইতে কতক্ষণ থাকে? আমদানি নাই কেবল রপ্তানি,—রাজার ভাণ্ডার টুটিয়া যায়;—কালাচাঁদের ভাণ্ডার ত কোন্ ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র!

টাকা ফুরায় আর কালাচাঁদ ভাবেন—‘কুচ পরোয়া নেহি’; আমি এখন সৎ, সাধু, নিষ্পাপ,—সুতরাং আমার কষ্ট কিছুতেই ঘটিবে না। ভগবান নির্দ্দোষ; নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিকে কষ্ট দিবেন কেন? আমার নিজের ভাবনা আমি

কিছুই ভাবি না; আমার একটা পেট পূর্ণ করিতে কতক্ষণ? একবেলা মুটেগিরি করিয়া আসিলেও আমার উদর পরিপূর্ণ হইবে। এর জন্য আর চিন্তা কি?

আচ্ছা, কোন কাজ-কর্ম্ম করিলে ক্ষতি কি? অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে, সর্ব্ব-দিকেই সুবিধা। হাতে অর্থ থাকিলে দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হইব।

কৃপণ ব্যক্তি 'যখের' ধন আগুলিয়া রাখে; নিজেও খায় না, অপরকেও খাইতে দেয় না। কত কাঙ্গালী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়; তবু কৃপণ ব্যক্তি তাহাকে একটী পয়সাও দেয় না। দেশের সমস্ত টাকা যদি প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে সমভাগে থাকে, তাহা হইলে কাহারও কোন কষ্ট হয় না। কোন ব্যক্তি টাকার উচ্চ পাঁজা সাজাইয়া, তাহার উপর রত্ন-সিংহাসনে বসিয়া আছেন; কেহ বা ভূতলে, কণ্টকাকীর্ণ গর্ত্তের নীচে দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছে না! কেন এমন হয়?

ভগবান কি একচক্ষু, দয়ামায়া-হীন? কাহারও খাইয়া খাইয়া পেট ফুলিয়া উঠিয়া, ফাটিয়া যাইতেছে; কাহারও না-খাইতে পাইয়া, আঁত মরিয়া গিয়া, পেটের চাম্‌ড়া পিঠে ঠেকিতেছে! ঈশ্বর এমন বিসদৃশ নিয়ম কেন করিলেন?

যাই-হউক, আমার অর্থ হইলে, দুঃখী দরিদ্রকে দান করিয়া তাহার সদ্ব্যয় করিব। একটা চাকূরীর চেষ্টা দেখাই ভাল। না,—ব্যবসা করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট! ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে মূলধন কোথা পাইব? আমার ত সঙ্গতি কিছুই নাই,—কেমন করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিব? প্রথম চাকুরীই করিব। কিছু মূলধন জমিলে শেষে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিব।

কিন্তু চাকুরির জন্য যাই কোথা? কাকে গিয়া বলি? কেইবা আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া, আমার চাকুরি করিয়া দিবে?

আমার ঠাকুরদাদার হুগলীসহরে প্রবল প্রতাপ। তিনি প্রভূত ধনশালীও বটেন। বহু-ব্যক্তি তাঁহার

কথার বশ। তিনি মনে করিলে, একদিনেই—এক দণ্ডেই আমার একটা চাকুরি করিয়া দিতে পারেন। বিশেষ, তাঁহার অপেক্ষা এ সংসারে আমার আত্মীয় আর কেহই নাই। আমার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই,—কেহই নাই;—আপনার বলিতে আছেন কেবল,—ঐ একমাত্র ঠাকুর-দাদা। তাঁহার কাছে যাই, তাঁহার পায়ে ধরি, কাঁদি,—বলি,—'আমি বড় হতভাগ্য। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি না রাখিলে, আর কে স্থান দিবে? আপনিই আমার সব। আপনি ভিন্ন আর আমার কে আছে? আপনার চরণে শরণ লই-তেছি,—আমাকে পায়ে ঠেলিবেন না।' ঠাকুর-দাদাকে একথা বলিতে ত কোন দোষ নাই! কল্য তাহাই গিয়া বলিব।

কিন্তু ঠাকুরদাদা আমায় চরণে স্থান দিবেন কি? শুনিতে পাই, তিনি আমার উপর খড়্গ-হস্ত। শুনিতে পাই, আমার নামে তিনি ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করেন। শুনিতে পাই, আমার

ছায়ায় তিনি লাথী মারেন। শুনিতে পাই, আমাকে নাতী বলিয়া পরিচয় দিতেই তিনি লজ্জিত হন। যদি কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরে, তাহা হইলে বলেন,—'কেলে-ছোঁড়া আমার জ্ঞাতির জ্ঞাতি, তস্য জ্ঞাতি,—গ্রামসম্পর্কে নাতী হইলেও হইতে পারে।' বিধাতার কেন যে এই বিড়ম্বনা, তাহা'ত বুঝিতে পারি না। ইহজন্মে আমি তাঁহার কখন মন্দ করি নাই, মন্দ ভাবিও নাই,—তথাচ কেন-যে তিনি আমার উপর এরূপ বিদ্বেষভাবাপন্ন,—ইহার গূঢ়রহস্য ভেদ করিতে কিছুতেই সক্ষম নহি।

যখন বর্দ্ধমানে আমি দায়রা-সোপরদ্দ হই, তখন শুনিয়াছিলাম, ঠাকুরদাদা আমাকে জেলে পূরিবার জন্য, আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমার তদ্বির করিতেছেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি,—আমি এ-কথা তখন তিলার্দ্ধও বিশ্বাস করি নাই। কোথা হুগলী, আর কোথা বর্দ্ধমান,—মধ্যে বিশ ক্রোশ পথ ব্যবধান। এতদূরে, হুগলীতে অবস্থিতি করিয়া,

ঠাকুরদাদা আমাকে যে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বর্দ্ধমানে লোক পাঠাইয়া ষড়্‌যন্ত্র করিবেন,—এ কথা কাহার মনে স্থান পায়? বিশেষ, আমি ঠাকুরদাদার আপনার-লোক—স্নেহের পাত্র,—আর, কোন কালে তাঁহার সহিত বিবাদ নাই, বচসা নাই,—কেনই বা তিনি আমার অনিষ্ট অনুসন্ধানের চেষ্টা করিবেন? কাজেই তখন আমি ঠাকুরদাদার তদ্বিরের কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই; হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন যেমন শুনিতেছি, বুঝিতেছি,—তাহাতে আমার স্থির-বিশ্বাস,—ঠাকুরদাদা বর্দ্ধমানে আমার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তদ্বির করিয়াছিলেন। তাই ভাবি,—কেন এমন হইল?

আচ্ছা, ঠাকুরদাদা প্রকৃতই আমার উপর বিরূপ কি না,—তাহা'ত একবার স্বয়ং সশরীরে বুঝিয়া আসা ভাল। কেবল শুনা-কথায় ঠাকুরদাদার উপর এরূপ অভিযোগ আনা ত উচিত নহে। একবার তাঁহার কাছে যাই না কেন? যাইয়া স্বচক্ষে একবার দেখা ভাল। তিনি ত বাঘ নন

যে, আমাকে দেখিলেই অমনি গিলিয়া ফেলিবেন। আর, আমাকে গ্রাস করেই বা কে?

যাওয়া উচিত। যাইব। কল্যই যাইব। কাল-বিলম্বে ফল নাই।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, কালাচাঁদ বন্ধু-পতিত-পাবনকে কহিলেন, "বন্ধু! আমি এক জায়গায় বেড়াতে যাচ্চি। তুমি যাবে কি?"

পতিত। কোথা?

কালাচাঁদ। ঠাকুরদাদার বাসায়।

পতিত পূর্ব্বমুখ হইল। ঊর্দ্ধপানে চাহিল। চাহিয়া, যুক্তকরে, প্রণাম করিতে লাগিল। বলিল,—"দণ্ডবৎ! দণ্ডবৎ! ঈস্! সকালে উঠেই ঐ নাম! আজ অন্ন হবে না।"

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) কেন? কেন?—তাঁর কি এতই অপরাধ?

পতিত! বন্ধু! তুমি জান না। মাছ সম্বরবে, তা তেল দেবে না। ঠিক্ যেন মড়াপোড়ার গন্ধ উঠে। আলু-ভাতে খাবে, তা নুন দেবে না। ঐ

পাকা বুড়ো পিঁপ্‌ড়ের গা-টিপে গুড় বা'র করে;—ওর কি মুখ দেখ্‌তে আছে?

কালাচাঁদ। বন্ধু! ঠাকুরদাদার উপর তুমি অত চট্‌লে কেন?

পতিত। আমিই না হয় চটেচি! তোমারই বা আজ অত ভক্তি উথ্‌লে উঠ্‌লো কেন? নাতীকে বাগে পেলে ঠাকুদ্দা এখনি ঘাড়ের রক্ত চুষে খান!—সে নাতীর আজ আর আদর দেখে বাঁচি না।

কালাচাঁদ। আমি যা বল্‌বো,—বন্ধু তার ঠিক উল্টোটী বল্‌বে! বন্ধুর সঙ্গে কোন পরামর্শ ক'রে,—সুখ হয় না। যাহোক আর কোন কথায় কাজ নেই,—চল, বন্ধু! আমার সঙ্গে ঠাকুদ্দার বাসায় চল।

পতিত। আমি ত যাবোই না; তোমাকেও সে কুস্থানে যেতে দিব না। সে লোকটা খুনে। আমাদিগে দেখ্‌লেই, মেরে-ধরে হাড়-গোড় ভেঙ্গে চূর্ণ ক'রে দিবে। বাপ্‌! সে খানে কি আমি কাঁচা-মাথাটা দিতে যাবো?

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) সে ভয় তোমার নাই!

আমাকে মারে কে? আমাকে খুন করিতে অন্তত পাঁচ-শ লোক চাই। ঠাকুদ্দার ঘরে পাঁচজন দরোয়ান আছে বৈত নয়! এক-এক কীলে আমি পাঁচজনকে পাঁচ দিকে শুইয়ে রেখে আস্‌বো। তোমাকে সে সব কিছু চিন্তা কর্‌তে হবে না। যদি তেমন তেমন বাধে,—

পতিত। (সভয়ে) না বন্ধু! আমি যাবো না,—আমাকে ক্ষমা কর!

আজ প্রায় দেড় বৎসর হইল, পতিত ঠাকুরদাদার গৃহে জুতা খাইয়াছিল। সেই চর্ম্ম-পাদুকা-প্রহার-রূপ-ভীতি পতিতের হৃদয়ে এখনও অষ্ট-প্রহরই উদিত হয়। কাজেই সে, ঠাকুরদাদার নিকট যাইতে একান্ত অসম্মত।

কালাচাঁদ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "বন্ধু! তা হবে না! তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে! তোমাকেই সেখানে দরকার। আমি একা গেলে যদি হ'তো, তা'হলে এতক্ষণ আমি চলে যেতাম।"

পতিতই ভয়ে কাঁপিয়াই আকুল। কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল. "হেঁই বন্ধু! তোমার পায়ে পড়ি। তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যেয়ো না। আমি গেলেই খুন হবো।"

পতিতের একটী গাভী ছিল। পতিত বলিত, গাভীটী স্থরভী-জাতীয়। জাতিতে যাহাই হউক, পতিত প্রাণ-খুলিয়া গরুটীর সেবাযত্ন করিত,—যেখানে যা-কিছু পাইত, গাইকে আনিয়া খাওয়াইত। কোঁচার খুঁট দিয়া গোরুর গা মুছাইয়া দিত। লোকের নিকট প্রকাশ করিত,—"গাভী মা-ভগবতী। যে ঘরে গোরু নাই, সে ঘর শ্মশান। আমি যে এই গাইটীকে এত ভক্তি করি, তাহা দুধের জন্য নহে;—মায়ের সেবার জন্য—পরকালের জন্য।" দুগ্ধের জন্য গো-সেবা না করিলেও, গাভীটী খুব দুধ দিত। খুব ভক্ত হইলেও, পতিত মা-ভগবতীর সেই দুধ বাজারে বেচিত।

পরম ভক্ত পতিতপাবন, শণ কিনিয়া, ঢেরায়

দড়ী কাটিয়া, সম্প্রতি স্বয়ং স্বহস্তে গোরুর জন্য একগাছি দড়া ভাঙ্গিয়াছিল। প্রকৃতই সে দড়াগাছটী মোটা এবং শক্ত। গত কল্য, সে দড়া পতিত, বন্ধুবান্ধবগণকে দেখায়;—বলে;—"ইহাতে পাকের এরূপ কৌশল আছে যে, ইহা একবারে বজ্র হইয়াছে। দশটা হাতী একত্র হইয়া টানিলেও, এ দড়া ছিঁড়িবে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ইহা ছিঁড়িতে পার, তাহা হইলে আমি তাহাকে পাঁচ টাকা দিব।"

একে একে সকল বন্ধু দড়া পরীক্ষা করিল। দড়া ছিঁড়িতে না পারিয়া সকলেই পতিতের নির্ম্মাণ-কৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিল। শেষে পতিত, কালাচাঁদকে বলিল,—"বন্ধু! তুমিত লোহার শিকল ছিঁড়িয়া থাক,—এই দড়াগাছটী একবার ছেঁড় দেখি—দেখি, কেমন তোমার শক্তি! এ দড়া স্বয়ং পতিতের বুড়ো-আঙ্গুলের টীপুনি দিয়ে ভাঙ্গা,—কার সাধ্য ছেঁড়ে?"

কালাচাঁদ হাসিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,

"পতিত অর্দ্ধপাগল। ও মনে করে, কেবল গায়ের জোরেই শিকল ছেঁড়া যায়, দড়া ছেঁড়া যায়, কবাট ভাঙ্গা যায়, দ্বিতল গৃহ হইতে লাফাইয়া পড়া যায়। কিন্তু তাহাত নয়। অবশ্য গায়ের জোর কিছু চাই বৈকি?—কিন্তু গায়ের জোর ছাড়া আর একটা জোর আছে, যাহার দ্বারা সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। সেই জোরের নাম কৌশল-বোধ, হিসাব-জ্ঞান, তুকতাক, এবং অভ্যাস। আমি মনে করিলে, অনায়াসেই এ দড়া ছিঁড়িতে পারি। কিন্তু এত লোকের সাক্ষাতে সে বাহাদুরি দেখাইয়া ফল কি? লাভের মধ্যে, পতিতের এত সাধের দড়াগাছটী নষ্ট হইবে।"

এইরূপ ভাবিয়া কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন,—"না, বন্ধু!—এ দড়া কি আমি ছিঁড়তে পারি?—আমার মত এক-শ লোক এলেও পার্‌বে না!"

পতিত। তবে তোমার কিসের শক্তি?

গতকল্য এইরূপই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। অদ্য

যখন পতিত, ঠাকুরদাদার বাসায় যাইতে ভীত হইল, তখন কালাচাঁদ নিজ পরাক্রম দেখাইয়া পতিতের সাহস বৃদ্ধির জন্য, দোয়ার হইতে সেই দড়াগাছটী লইয়া, এক হেঁচ্‌কাটানে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পতিত অবাক্‌। এত পরিশ্রম-লব্ধ, প্রাণসম দড়াগাছ্‌টীকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া, সত্যসত্যই পতিতের চক্ষে জল আসিল। একে, সে, ভয়ে অস্থির, তার উপর দড়ার শোক! শোক বলিয়া শোক!—মহাশোক! দেহ হইতে দক্ষিণ বাহু বিচ্ছিন্ন হইলেও, পতিতের এত শোক হইত না।

সুখের মধ্যে এই যে, শোক-সামগ্রীটী অধিকক্ষণ পূর্ণমাত্রায় তিষ্ঠে না। একটু সুস্থ হইয়া পতিত ভাবিল, "কালাচাঁদ ভীম, না, ভগদত্ত? এমন আশ্চর্য্য শক্তি ত আমি কোথাও দেখি নাই!"

কালাচাঁদ দড়া ছিঁড়িয়া হাসি হাসি মুখে বলিলেন, "বন্ধু! দেখ্‌লে ত আমার গায়ে জোর কত! এখনও কি আমার সঙ্গে ঠাকুদ্দার বাসায়

যেতে তোমার ভয় হয়? যদি ভয় হয়, তবে খুলে বল;—আরও একটা শক্তির পরিচয় না-হয় দেখাই!”

পতিত কিংকর্ত্তব্যজ্ঞানহীন। হৃদয়-কমল আন্দোলিত। সে, এইভাবে ভাবিতে লাগিল,—“অদ্যকার কালরাত্রি কি আমারই জন্য পোহাইয়াছিল? যদি আজিকার দিন বাঁচি, তাহা হইলে পতিত বোধ হয় এক-শ কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে। বন্ধুকে যদি বলি, আমার এখনও ভয় আছে, তাহা হইলে বন্ধু হয় ত এখনি আর একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড করিয়া ফেলিবেন। হয় ত বাই-ঠুকিয়া আমার বড় ঘরের দেওয়ালটা ভঙ্গিয়া দিবেন। হয় ত আমার এই দো-ফলা আমগাছটা সজোরে উপড়াইয়া ফেলিবেন। হয় ত জোর দেখাইবার জন্য, আমাকেই উর্দ্ধে এক-শ হাত উচ্চে ছুড়িয়া ফেলিয়া, লুফিয়া লইবেন। আমাকে রামে মেলেও মেরেচে, রাবণে মেলেও মেরেচে। বন্ধু এখন যা বলেন, সেই কথাই শোনা ভাল।”

এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে পতিত বলিল,—"বন্ধু! তোমার সঙ্গে তবে আমি যাবো;—কিন্তু দেখো বন্ধু! শেষে যেন প্রাণে মরি না।"

কালাচাঁদ কহিলেন,—"ভয় নাই।"

পতিতের সঙ্গ ব্যতীত কালাচাঁদ যে, ঠাকুরদাদার গৃহে যাইতে অক্ষম, তাহা নহে! পতিতকে সঙ্গে লইবার বিশেষ যে, কোন কারণ ছিল, তাহাও নহে। তবে কালাচাঁদ এত জেদ ধরিলেন কেন?—কেবল মজা করা ভিন্ন অন্য কোনও কারণ ত দেখি না। পতিত ভয়ে ভীত হইয়া বলিল, 'যাইব না,'—কালাচাঁদের মজা হইল। ভীত ব্যক্তি দেখিলে, কালাচাঁদের আনন্দ হইত। পতিত ভীত হইয়াছে; অতএব পতিতকে সেই ভয়সঙ্কুল স্থানে লইয়া যাইতে হইবে;—ইহাই হইল,—কালাচাঁদের রঙ্গরস, রসিকতা, রস-চাতুরি!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ, পতিতের সমভিব্যাহারে, ঠাকুরদাদার বাসায় গেলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তথায় আদৌ আদর-অভ্যর্থনা পাইলেন না। ঠাকুরদাদা, নাতীকে দেখিয়া মহা বিরক্ত হন; মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া থাকেন; যে দু-একটী কথা কন, তাহাতে বিরক্তি এবং ব্যঙ্গের ভাবই প্রকাশিত হয়। কালাচাঁদ শুষ্কমুখে প্রত্যাগত হইলেন। পতিত বলিল, "বন্ধু! দেখ্‌লে,—আমি যা বলেছিনু, তাই ঠিক্ হ'লো! আমি মর্‌বো কবে, তাই জানি না,—নহিলে, পতিত জানেনা কি?"

কালাচাঁদ। তুমি যা বলেছিলে, ঠিক্ তার উল্টা হলো।

পতিত। উল্টা হবে কেন?—ঠিক্‌ই হয়েচে।

কালাচাঁদ। তুমি বলেছিলে, ঠাকুদ্দা দুজনকেই খুন ক'রে ফেল্‌বেন; না হয়, মেরে পিঠ ছিঁড়ে দিবেন।

পতিত। খুন কে কাকে করে? এ কোম্পানীর

মুলুকে খুন আর কাকেও কত্তে হয় না! কথার কথা একবার বলেছিলেম ব'লেই কি, ঠাকুদ্দা অমনি দুইটা জেয়ান্ত মানুষকে খুন কত্তে পারেন! বন্ধু! তুমি কি তামাসা বুঝ না?

কালাচাঁদ। তা, আর কৈ বুঝিতে পারিলাম!

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে দুই বন্ধুতে বাসায় প্রত্যাগত হইলেন। সন্ধ্যার পর আবার পতিতকে সঙ্গে লইয়া, কালাচাঁদ অন্যান্য আত্মীয়, গ্রামস্থ ব্যক্তির বাসায় গেলেন। তিনি যেখানে যান, সেইখানেই উপেক্ষিত এবং উপহসিত হন। কোথাও কালাচাঁদ স্নেহ, ভালবাসা,—অধিক কি, মৌখিক মিষ্ট কথা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহার ভগ্নমন আরও ভাঙ্গিল।

কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন, আমি এখন সচ্চরিত্র, সাধু, সত্যবাদী হইয়াছি,—তথাচ লোকে আমাকে এত ঘৃণা করে কেন? এরূপ উপহাসইবা করে কেন? লোকগুলা বড়ই বদ্। লোকগুলা চোর, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক।

লোকগুলা মন্দ হয়, হউক;—আমি কিন্তু সৎপথ কখন ছাড়িব না। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, আমাকে সৎপথাবলম্বী দেখিলে, অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন। ভগবানের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে, অনলে, জলে, শৈলে, রণে, বনে, ভবনে,—কোথাও আমি কষ্টে বা সঙ্কটে পতিত হইব না। আমি মানুষের ভালবাসা চাই না। ভগবানই আমার ভরসা। ভগবান আমাকে ভালবাসুন। হে ভগবন্! আমি তোমার ক্ষুদ্র দাস;—চরণাশ্রিত, সেবক। তুমি অসীম, অনন্ত, অক্ষয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার উদরে অধিষ্ঠিত। তুমি স্নেহময়ী যশোদাকে, লীলাচ্ছলে, তোমার মুখাভ্যন্তরে সমুদায় সংসার দেখাইয়াছিলে। তুমি ভক্তের অধীন, তুমি ভক্তের বৎসল। প্রাণ-সঙ্কটে তুমি ধ্রুব-প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছ। হে শ্রীমধুসূদন! কুরুসভায়, তুমিই দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছ। হে দীনবন্ধু! সুধন্বাকে তপ্ততৈল হইতে রক্ষার তুমিই কারণ। হে প্রভু! আমার বাপ নাই, তুমিই আমার

পিতা; আমার মা নাই, তুমিই আমার জননী; আমার বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই, তুমিই আমার সুহৃদ্! প্রভু! তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা, যেন মন্দকর্ম্ম করিতে আর মন না যায়। আমি পাপী, দুরাচার, অকৃতী, অধম। তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে, আমার আর উপায় নাই। প্রভু! আমার কেবল এই মিনতি,—তোমার চরণযুগলে স্থান দিও।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কালাচাঁদের হৃদয় কতকটা সুস্থ হইল! মন ঠাণ্ডা হইলে, তিনি গো-সেবায় তৎপর, পতিতপাবনকে বলিলেন, "বন্ধু! তুমি আজ কি খাবে বল? লুচি বল, খিচুড়ি বল, সরুচাকলি বল,—এ তিনের মধ্যে, তুমি যা'বল, তাই খাওয়াইব।"

বন্ধু তখন খুব কুঁচি কুঁচি করিয়া গোরুর জাব কাটিতেছিল। আহারের নামে অর্দ্ধ-কর্ত্তিত খড়-আটিটী ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। ঝটিতি কালাচাঁদের নিকট আসিয়া বলিল,—"বন্ধু! তুমি আমার খাবার

কথা ব'ল্‌চো বটে,—কিন্তু আমার মুখে কোন জিনিস্‌ আর রোচে না! ভাত খাওয়াত উঠে গেছে! এই, আধ্‌পো চেলের অন্ন রাঁধি,—তারই বার-আনা-ভাগ পাতে পড়ে থাকে। তবে একটু তুধ খেয়ে থাকি। তুধই হ'লো আমার এখন জীবন। তা, আমাকে লুচি, খিচুড়ি খাবার কথা বলা বৃথা। তবে তুমি বল্লে'ত কথা এড়াতে পারি না—"

কালাচাঁদ। ওসব কথা যাক্‌। এখন বল,—ঐ তিনটা জিনিসের মধ্যে কোন্‌টা খাবে?

পতিত এইবার বড় বিপদে পড়িল। সরুচাক্‌লিটে তাহার বড়ই প্রিয়তম। সরুচাক্‌লির নামে তাহার রসনা লহ-লহ করে। কিন্তু এদিকে লুচি, ওদিকে খিড়িচু। এ তুইটার মধ্যে কোনটাইত মন্দ জিনিস নহে। লুচি হইলে, দই, তরকারি, সন্দেস থাকিবে। কিন্তু খিচুড়ি হইলে মাছ ভাজা, মাছের কালিয়ে থাকিতে পারে। দই ত হইবেই। খিচুড়িতে দই না খাইলে গরম হয়। আর, শেষে মিষ্টিমুখ করিবার জন্য অবশ্যই সন্দেস থাকা চাই। তবে

লুচি-খিচুড়ির মধ্যে খিচুড়িটেই ভাল। কিন্তু লুচি-সামগ্রীটা সর্ব্ব-মনোহর! আচ্ছা করিয়া ময়ান দিয়া, একটু খর-খর করিয়া ভাজিয়া, অল্প গরম গরম থাকিতে থাকিতে খাইতে পাইলে,—খিচুড়ি কোথায় লাগে? কিন্তু আমি যে, সরুচাক্‌লিটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি—তাহার কি? খাঁটি দুধের পরমান্নের সহিত সরুচাক্‌লি মাখিয়া খাইবার সময় যে কিরূপ আরাম, সোয়াস্তি হয়—তাহা আর বলিবার নহে। আ—আঃ—আহা,—গরাসে গরাসে যেন চাঁদ নিঙড়িয়া সুধা খাইতেছি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সরুচাক্‌লি খাইলে বড়-মাছের মুড়ার কালিয়ে পাইব না। বন্ধু বলিবে,—সরুচাক্‌লির সঙ্গে আবার মাছ খাওয়া কি? সুতরাং আমি বলি কি? কোন্ জিনিস্‌টা খাই?—এ-যে দেখিতেছি,—আমার পক্ষে সবই সমান হইয়া দাঁড়াইল!

কালাচাঁদ। বন্ধু! এত ভাব্‌চো কি? বল না কি খাবে?

পতিত মাথা চুলকাইতে লাগিল; কিছুই ঠিক

করিতে পারিল না। ভাবিল, "অদ্যকার বড়ই গুরুতর সমস্যা। বিশেষ না ভাবিয়া, না বুঝিয়া, হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইবে না। রাত্রে শুইয়া-শুইয়া, সমস্তক্ষণ জাগিয়া জাগিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, একটা যা-হয়, ঠিক করিয়া, বন্ধুকে কল্যপ্রাতে ইহার উত্তর দিব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, একটু বুদ্ধিব্যয়পূর্ব্বক পতিত বলিল,—"বন্ধু! ক্ষুধাটা মন্দা আছে;—আজ না হয় থাক্—কাল খাওয়ান হবে।"

কালাচাঁদ। তাও কি কখন হয়? পূজারি-ঠাকুরকে বলে এসেচি,—তিনি এসে রাঁধ্‌বেন!

পতিত জানে,—কালাচাঁদ যাহা ধরে, তাহা সহজে ছাড়ে না। নিরুপায় হইয়া বলিল, "আচ্ছা, বন্ধু! সরুচাকলি হ'লেত পায়েস নিশ্চয়ই হচ্চে—

কালাচাঁদ। তা, অবশ্য হবে।

পতিত। আমি সে কথা বল্‌চি না—পায়েস ত হবেই! আমি বল্‌চি কি,—বড় মাছের কালিয়ে হবে না কি?

কালাচাঁদ। আচ্ছা,—তুমি বল ত,—তাও হবে।

পতিত। আমার কোন বলাবলি নেই,—তোমার ইচ্ছা হয়—হোক; না ইচ্ছা হয়…………, কি জান্‌লে, বন্ধু! বড় মাছের মুড়া জিনিসটা ভাল।

কালাচাঁদ। আচ্ছা, মাছের কালিয়াও করা যাবে।

পতিত। বন্ধু! একসের ময়দায় আদসের ঘিয়ের ময়ান দিয়ে, তুমি কখন কি লুচি খেয়েছ?

কালাচাঁদ। না।

পতিত। আমি খেয়েচি। তোমার ঠাকুদ্দার কাছ থেকে আইবুড়ো-ভাতের তত্ত্ব নিয়ে আমি একবার রাজবাড়ীতে যাই। রাজা অনেকদিন মরে গেছেন,—রাণীই কর্ত্তা। রাণী আমাকে একটা সিধে দিলেন,—আধমণ চাল, দশসের ময়দা, পাঁচসের ঘি, পাঁচসের একটা মাছ,—আরও যে কত-কি সিধেতে ছিল, তা আর কি বল্‌বো। সিধে দেখেই ত আমার আত্মাপুরুষ উড়ে গেল। ভাব্‌লাম,—

এত সিধে নিয়েইবা আমি কি কর্‌বো? তখন মনে হ'লো, একসের ময়দায় আধসের ঘিয়ের ময়ান দিয়ে লুচি তৈয়ের করা যা'ক্!—দেখি-না কেমন হয়! তাহাই করিলাম। বন্ধু! লুচি যা তৈয়ের হলো, তা আর তোমাকে কি বল্‌বো? মুখে দি,—আর মিলিয়ে যায়! সে লুচি ঠোঁটের কাছে ঠেকাই,—আর নাই!—ঠোঁটের কাছে ঠেকাই,—আর নাই! বুকের কল্‌জেটা-সুদ্ধ একেবারে সাফ হয়ে গেল। সে রকম লুচি সেই একবার কোন্‌-কালে খেয়েছিলেম,—আর খাই নাই। বন্ধু! আমার ইচ্ছে যে, তোমাকে একদিন সে-রকম লুচি খাওয়াই! যদি বল, তবে আজই, সরুচাক্‌লি তৈয়েরির সময় পূজারি-ঠাকুরকে দিয়ে, সেরখানেক ময়দার সে-রকম লুচি ভাজাই।

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) একসের ময়দায় আধসের ঘি ময়ান দিলে যে, লুচি গুঁড়ো হয়ে যাবে—খোলায় ভাজা হবে কেন? ঘিটেও নষ্ট হবে, লুচিও কেউ খেতে পাবে না।

পতিত। আমি বল্‌চি, হবে! যদি না হয়, তবে তার দায়ী আমি আছি।

কালাচাঁদ। তাই হোক,—আমার আপত্তি নাই।

পতিত। বন্ধু! আমি নিজের খাবার জন্য বলি নাই;—তোমাকে খাওয়াব, এই আমার সাধ। তুমি খেলেই আমার তৃপ্তি।

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) তবে আর খিচুড়ীটে বাকী থাকে কেন?—খিচুড়ীও হোক।

পতিত। (হাঁ—হাঁ রবে) তা হবে না, তা হবে না,—এত জিনিস খাবে কে? পয়সা নষ্ট করা তোমার একটা রোগ বৈত নয়! (একটু থামিয়া) তবে বন্ধু! তোমার যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা'হলে ভুনিখিচুড়ীই না-হয় হোক। তোমার কোন কাজে আমি বাধা দিতে পারি না।

সে রাত্রি সরুচাক্‌লি, লুচি, খিচুড়ি তিন রকমই হইল। পতিতের অন্তরের আশা পূর্ণ হইল। এমনটা শুনা গিয়াছে, আহারের পর তিনদিন

পতিত কোন কাজকর্ম্মে বাহির হইতে পারে নাই। পতিত বলিত,—"পায়ে গেঁটে-বাত হইয়াছে।" বন্ধু-বান্ধবগণ বলিত, "আহারের রাত্রি—অর্থাৎ ভোর বেলা—হইতে পতিতের এমন একটী ব্যারাম হইয়াছে, যাহার নাম করিলেই পতিত রাগিয়া উঠে।"

পতিতের নামে কালাচাঁদ এইরূপ আহারাদির উদ্যোগ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। প্রতিবেশীগণের মধ্যে যাহারা দীনদরিদ্র, যাহারা উদরপূর্ণ করিয়া কখন খাইতে পায় না, কালাচাঁদ তাহাদিগকে ধরিয়া-ধরিয়া আনিয়া ভোজন করাইতেন। গৃহস্থ-ঘরের যে সকল দুঃখিনী রমণী, কালাচাঁদের বাসায় আসিয়া খাইতে সম্মত হইত না, পূজারি-ঠাকুরের দ্বারা কালাচাঁদ, তাহাদের লুচি সন্দেস পাঠাইয়া দিতেন। বন্ধু পতিতপাবন, এ সব কার্য্যে বড়ই প্রতিবাদ করিত; বলিত,—"তোমার পয়সা রাখ্‌বার ত যায়গা নেই,—খাওয়াচ্চ কি না ভূতগুলাকে, আর পেত্নীগুলাকে।" কালাচাঁদ

বলিত,—“বন্ধু! এরা কখন লুচি সন্দেস খেতে পায় না—এক দিন খাগ্।”

বলা বাহুল্য, এরূপ দরিদ্র-ভোজনে কালাচাঁদের কোনও আড়ম্বর ছিল না। এদিকে পূজারি-ঠাকুর রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিলেন, ওদিকে কালাচাঁদ সন্ধ্যার পর ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। গয়ারামের বাটী গিয়া দেখিলেন, চাঁদের আলোকে গয়ারাম বিচালির বড় পাকাইতেছে। অমনি আস্তে-আস্তে গিয়া, পশ্চাৎ হইতে গয়ারামের পিঠে দুই কীল। গয়ারাম ভয়ে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, পশ্চাতে কালাচাঁদ। সে তখন আর কোন কথা কহিল না। নমস্কার করিয়া যোড়হাতে দাঁড়াইল।

কালাচাঁদ কহিলেন, “তুই এখনও বসে আছিস্—যা,—আমার ওখানে যা। বুঝেচিস্,—ছেলেপিলেকে নিয়ে যাস্।”

গয়ারাম যোড়হাতে প্রণাম করিয়া বলিল,—“যাচ্চি।”

বৃদ্ধ হলধর তাঁতির চিরদিনই অন্নকষ্ট। কালাচাঁদ

গিয়া, তাহার চোখ টিপিয়া ধরিলেন। বুড়া ভয়ে "আঁউ মাঁউ" করিয়া উঠিল।

কালাচাঁদ। আমি কে, বল,—তবে চোখ্ খুলে দিচ্চি।

হলধর। আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না,—আপনি যে হও,—পায়ে পড়ি, চোখটী খুলে দাও,—হাঁপিয়ে মরে গেনু—

কালাচাঁদ। সন্দেস্ খাবি? ক গণ্ডা খাবি বল্?

হলধর। বুঝেচি—বুঝেচি—তুমি ঠাকুদ্দা—

কালাচাঁদ তখন হাসিয়া চোখ খুলিয়া দিলেন। বলিলেন,—এখনি যা—দৌড়ে যা—আমার বাসায় আজ ভারি মজা।

কালাচাঁদের নিমন্ত্রণ-প্রথা এইরূপই ছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ একদিন তাঁহার তহবিল গণিলেন। দেখিলেন, আর ৫১৲ একান্নটী মাত্র টাকা মজুদ আছে। ভাবিলেন,—"ফুরাইয়া ত আসিল। ৫১৲ টাকায় আর কদিন চলিবে? হদ্দ—বড় জোর এক মাস। তার পর কি? অর্থ কোথা পাই? খাই কি?—খাওয়াই কি?

চাকৃরি!—তা, যার কাছে যাই, সে-ই আমাকে দেখিয়া উপহাস করে। যে ব্যক্তি উপহাসের পাত্র, সে, চাকুরির প্রস্তাব করিবে কেমন করিয়া? চাকুরির জন্য ত পাঁচ সাত স্থানে গমন করিলাম,—কিন্তু সর্ব্বস্থানেই যে, অবমানিত হইলাম।

পুনরায় তাঁহাদের নিকট যাই-না কেন? তোষামোদ করিয়া বলি,—আমাকে একটী চাকুরি দাও। তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া পীড়াপীড়ি করি-না কেন?

পায়ে ধরিতে কোন ক্ষতি নাই,—কিন্তু ধরি কার্? পায়ে ধরিবার উপযুক্ত পাত্র কৈ? যে কয়জন লোকের নিকট চাক্‌রীর উমেদারীতে গিয়াছিলাম,—তাঁহাদের সকলেই ভাগ্যবান্, ক্ষমতাবান্, অর্থবান্ বটেন,—কিন্তু কেহই ত সৎস্বভাব-সম্পন্ন নহেন! মাথামুণ্ড কি আর বলিব,—সকল বেটাই চোর। ইহাঁদের মধ্যে কেহ হইলেন, লম্পটকুল-চূড়ামণি; কেহ হইলেন, জালিয়াৎ-কুলতিলক; কেহ হইলেন, দস্যুবংশাবতংস; কেহবা সর্ব্বগুণধর;—তিনি হইলেন, লম্পটকুল-চূড়ামণি+জালিয়াৎ-কুলতিলক+দস্যুবংশাবতংস। এই সমস্ত পাপী পাষণ্ড ব্যক্তির সেবা করিতে আমি কিছুতেই সক্ষম হইব না। এক পয়সা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারি, তাও স্বীকার,—খাইতে না পাই, তাও স্বীকার,—ভিক্ষা করিতে হয়, তাও স্বীকার,—তথাচ আমি মূর্ত্তিমান্ মল-মুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম হইব না।

আমি এখন সাধু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়,—এই

কয়মাস আমার চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা তিলমাত্রও স্পর্শ করে নাই,—আমি খাইতে-মাখিতে পাইব না; আর, এই ঠক-ঠেঁটা, লম্পট-শঠ লোকগুলা চিরদিনই পরমভোগে পরিতৃপ্ত হইতে থাকিবে,—ইহা কি কখন সম্ভবপর কথা? মাথার উপর ভগবান আছেন,—তিনি কি এসব দেখিতে পাইতে-ছেন না?

অবশ্যই ভগবান ইহার বিচার করিবেন। অবশ্যই আমি খাইতে পাইব।"

কালাচাঁদ আরও ভাবিতে লাগিলেন,—"এখন মোট মজুদ ৫১৲ টাকা। এইটীই এখন জীবন। এইটী ফুরাইলেই, ভগবান ভরসা।

একান্ন টাকায় একমাসের অধিক চলিবে না। ত্রিশদিন পরেই কি আমাকে "হা অন্ন! হা অন্ন"—বলিয়া, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে হইবে? আচ্ছা, একটু কৃপণ হইনা কেন? অন্যান্য খরচ সমস্তই একেবারে বন্ধ করিয়া, কেবল নিজের উদর পূর্ণ করিনা কেন?

তাহাতে আর কত খরচ লাগিবে? মাসিক চারি টাকা হইলেই ভাসিয়া যাইবে। এরূপ করিলে, এক বৎসরেরও অধিককাল নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। কিন্তু তাহাতেই বা কি লাভ? এক বৎসর পরে ত আবার ঠিক সেই দশা!—সেই ভিখারীর ভাব—সেই ঝুলি—সেই হা-অন্ন—হা-অন্ন!

যদি অন্নের জন্য প্রকৃতই আমাকে ভিক্ষার ঝুলি বহন করিতে হয়, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? শুভস্য শীঘ্রং। একমাসের স্থানে আমি একবৎসর বৃথা অতিবাহিত করিব কেন?

কিন্তু সৎপথে থাকিলে, অর্দ্ধরাত্রে অন্ন হয়,—পণ্ডিতগণের মুখে কতবার এই কথা শুনিয়াছি। আমি কখনই নিরন্ন হইব না,—ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।"

দেখিতে দেখিতে একমাসের মধ্যে কালাচাঁদের ৩৮৲ আটত্রিশ টাকা খরচ হইল। সংক্রান্তির দিন হাতে নগদ ১৩৲ তেরটী টাকা রহিল। সেই দিন কালাচাঁদ কাঙ্গালী-ভোজন করাইলেন। মোটাচেলের

ভাত, কড়ায়ের ডাল, কুমড়ার তরকারি, এবং মাছের অম্বল,—বন্দোবস্ত হইল। দুইশত কাঙ্গালী বসিয়া খাইল। পূর্ণমাত্রায় আহার করিয়া, পরম-পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, কাঙ্গালীগণ কালাচাঁদের জয় গাহিতে-গাহিতে প্রস্থান করিল। সকলে চলিয়া গেলে, কালাচাঁদ, পতিতকে বলিলেন, "বন্ধু! তুমি একবার উঠানের মধ্যস্থলে দাঁড়াও।"

পতিত। কেন, কেন? কি হয়েচে?

কালাচাঁদ। একবার দাঁড়াওই-না ছাই?—

পতিত দাঁড়াইল।

কালাচাঁদ অমনি এক বকুনা কড়ায়ের ডাল আনিয়া পতিতের মাথায় ঢালিয়া দিল।

পতিত। করো কি, বন্ধু! করো কি?

কালাচাঁদ। বন্ধু! কেমন শোভা হইয়াছে, দেখ দেখি?

পার্ষদগণ উচ্চ-হাসি হাসিল। কালাচাঁদ কিন্তু হাসিলেন না।

পতিত একটু রাগ করিয়া উঠিল। বলিল,—

সন্ধ্যাবেলা আবার নাইতে হবে,—দেখ্‌চি। এমন কাজও করে কি? সর্দ্দি হ'য়ে মারা পড়্‌বো আর কি।

কালাচাঁদ। বন্ধু! রাগ ক'রো না।—আজই শেষ। আর কখন এমন দিন হবে না। আজ এ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হ'লো।
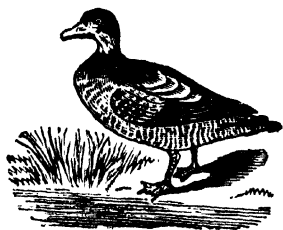
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ যে, অদ্য কপর্দ্দক-শূন্য হইলেন, পতিত তাহা জানিত না। একা পতিত কেন, এ সংবাদ কেহই অবগত ছিলেন না। তখনও লোকের ধারণা ছিল,—কালাচাঁদের হাতে অনেক টাকা আছে।

কালাচাঁদ ঠিক এক ভাবেই আছেন। অর্থযুক্ত-কালে, যে ভাব,—এখন, অর্থহীনকালেও তাঁহার সেই ভাব। কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই।

সংক্রান্তির দিন হইতেই মুদির দোকানে ধার আরম্ভ হয়। ক্রমে ধারেই সংসার চলিতে লাগিল। এক মাস কাল ধারে উঠ্‌না দিয়া, পর মাসের প্রথম দিবসেই মুদি, কালাচাঁদের কাছে তাগাদায় আসিল। কালাচাঁদ কহিলেন,—"আমার হাতে এখন কিছু নাই।"

মুদি। তা, থাক্—তা, আজ থাক্—যে দিন

আপনার সুবিধা হবে, সেই দিনই দিবেন। টাকার জন্য এসে-যাচ্চে কি? আপনি অতি মহাশয়-ব্যক্তি।

মুদি চলিয়া গেল। আবার দশ দিন পরে তাগাদায় আসিল। বলিল,—“আজ কিছু কি অনুগ্রহো ক’রবেন? পাইকেরের কাছ থেকে গুড় কিনেচি,—সব টাকা জোটাতে পারি নি—পাইকেরকে দোকানে বসিয়ে রেখে, আপনার কাছে এসেচি।

কালাচাঁদ। টাকা কড়ি, বাপু! আমার হাতে কিছুই নাই।

মুদি। কিছু দিন্‌না,—নিদেন পাঁচটা টাকাও দিন্‌না? বাকী টাকা দশ দিন পরে দিলেই হবে। তা, আপনার কাছে ত আমার টাকার ভাবনা নেই!

কালাচাঁদ। ৫৲ টাকা দূরে যাউক, পাঁচটী পয়সা আমার হাতে নাই।

মুদি। তবে আমি টাকার জন্য কবে আস্‌বো?

কালাচাঁদ। তাইবা ঠিক কেমন ক'রে বল্‌বো? তোমাকে আর আস্‌তে হবে না। টাকা হাতে এলেই, তোমাকে আমি পাঠিয়ে দিব—

মুদি। কি জানেন,—আমরা গরীব মানুষ,—পুঁজি-পাটা কম। এতটাকা আপনি যদি ফেলে রাখেন, তবে আমি দোকান চালাই কেমন করে? আমরা নগদ আনি, নগদ বেচি। আপনাদের দোয়ার থেকে দু-পয়সা নিয়ে গুজরান করি। তা, আজ কিছু না-হয় টাকা দিন্‌,—

কালাচাঁদ। বাপু! আজ একটী পয়সা থাকিলেও তোমাকে দিতাম,—

মুদি। আপনি যদি এমন করেন, তবে আর কোথা থেকে উঠ্‌নো যোগাব?

কালাচাঁদ। ইচ্ছা না হয়,—আর যোগাইও-না।

মুদি। আমি তা বল্‌চি না,—আমি আর পাবো কোথা,—তাই বল্‌চি।

কালাচাঁদ। সেই কথাত আমিও বল্‌চি—

মুদি। আমি, মোশাই! পরশু তারিখে

আস্‌বো—কিছু আমাকে যোগাড় ক'রে দিবেন। আমি আপনার উঠ্‌নো বন্দ কর্‌বো না—

কালাচাঁদ। তুমি উঠ্‌নো বন্দই কর। আমি এ কথা রাগ ক'রে বল্‌চি না—

মুদি। আমি যদি উঠ্‌নো বন্দ করি,—তবে আপনাকে ত নগদ চাল-ডাল কিনে আন্‌তে হবে।

কালাচাঁদ। পয়সা না থাক্‌লে, নগদ কিনিব কেমন করিয়া?

মুদি। আপনার সঙ্গে অনেক দিন থেকে লেন্‌-দেন, আলাপ-পরিচয়, তাই আমি ধারে দিতে পার্‌বো। অন্য কেহ ত ধারে দিবে না।

কালাচাঁদ। নাইবা দিলে?

মুদি। তখন ত নগদ পয়সা বা'র্‌ কত্তে হবে!

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) তোমার ত বড় আশ্চর্য্য কথা শুন্‌চি। মোটেই পয়সা না থাক্‌লে, কোথা থেকে নগদ পয়সা বার্‌ করবো?

মুদি। তবে, চাল ডাল কোথা থেকে আস্‌বে—বলুন?

কালাচাঁদ। কোথাও থেকে আস্‌বে না—

মুদি। তার পর!—

কালাচাঁদ। তার পর আবার কি?—

মুদি। খাওয়া-দাওয়া চল্‌বে কোথা থেকে?

কালাচাঁদ। কোথাও থেকে চল্‌বে না। আমি উপ'স করে থাক্‌বো।

মুদি। সে কি কথা?

কালাচাঁদ। আমার কথায় দোষ কি হইল?

মুদি। না খেলে মানুষ বাঁচে কি?

কালাচাঁদ। না,—বাঁচে না।

মুদি। তবে?—

কালাচাঁদ। আমি বাঁচিব না।

মুদি হাসিল।

কালাচাঁদও হাসিলেন।

যাত্রাকালে মুদি বলিল, "পরশু দিন আমি আস্‌চি,—সে দিন কিছু টাকা যোগাড় করে আমাকে দিবেন। সেদিন আর ফির্‌বো না।"

কালাচাঁদ মনে মনে কেবল হাসিলেন; কোন কথা কহিলেন না।

মুদি কালাচাঁদের উঠ্‌না বন্দ করিল না,—পর দিন যথানিয়মে সামগ্রী-পত্র পাঠাইয়া দিল। বরং অন্যদিন অপেক্ষা উত্তম উত্তম সামগ্রী পাঠাইল। অদ্যকার ওজন কম'ত নহে-ই, বরং খর-খর।

পরশ্ব দিন শীঘ্রই আসিল। মুদিও আসিয়া সমুপস্থিত হইল। কালাচাঁদ শুইয়া ছিলেন; মুদীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। হাসি হাসি মুখে মুদীকে বলিলেন,—"এস, এস—ভাল হয়ে ব'সো।"

সমাদর দেখিয়া মুদী ভাবিল,—আজ নগদ টাকা।

কালাচাঁদ মুদিকে আপ্যায়িত করিয়া, জিজ্ঞাসিলেন,—"আমি যদি আজ টাকা না দি, তা হ'ইলে তুমি কি কর?"

মুদি একটু হাসিল। ভাবিল; "সে দিন কিছু

কড়া তাগাদা হয়েছিল কি না,—তাই বাবু আজ টাকা মজুদ রে'খে,—আমার সঙ্গে তামাসা কচ্চেন।" মুদি প্রকাশ্যে বলিল,—"আপনারা ভদ্দর লোক; আপনারা যদি টাকা দিতে দেরী করেন, তা'হলে, আপনাদিগে কি আর বল্‌বো?—আর, আমি আপনাদের কর্‌বোই বা কি? নিতান্ত চলে না বলেই,—তাগাদায় আস্‌তে হয়।

কালাচাঁদ। কিছুই ব'লবে না!

মুদি। আজ্ঞে, তা কি কিছু বল্‌তে পারি?

কালাচাঁদ। বাপু! আমি একটী পয়সাও দিতে পার্‌বো না। আজও আমার একটী পয়সাও যুটে নাই।

মুদি। (বিস্ময়ে) বলেন কি মোশাই?

কালাচাঁদ। তুমি আর কেন কথা ক'চ্চ বাপু!—তুমি কেন চূপ করে উঠে চলে যাও না?

মুদি। তা'হ'লে যে, মোশাই! আমার সর্ব্বনাশ হবে! দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

কালাচাঁদ। আবার কথা ক'চ্চ! তুমি এই

মাত্র বল্লে যে, টাকা না পেলে, তুমি কোন কথা কবে না। তবে কেন, বাপু! কথা কও?

মুদি। (ক্রোধভরে) সে কি মোশাই?—আপনারা ভদ্দর লোক। আমরা মুরুক্ষু মানুষ। আমরা কি এত কথার কাটাকাটি বুঝ্‌তে পারি?—আপনি এখন টাকা দিবেন কি না বলুন?—ভদ্দর লোক হয়ে, এমন ক'রে টাকা ফাঁকি দিতে আছে কি?

কালাচাঁদ। (মিষ্টস্বরে) বাপু! তুমি কি আমাকে কিছু গাল্ দিতে ইচ্ছা করেচো?—তা, দাও, কিছু বল্‌বো না,—মনের সাধে গাল্ দাও।

মুদি। গাল্ কে দিচ্চে? আমাদের কার্‌বার্ যত ভদ্দর লোকের সঙ্গে। আমরা গালাগালি জানি না—কখন করিও না। সে-যা'হোক—মোশাই! টাকা দিন্। টাকা না পেলে আজ আমি আর ছাড়্চি না—

কালাচাঁদ। ছাড়িয়া কাজ কি? আমাকে লইয়া কি করিতে হয়,—কর।

মুদি। আমি আপনার সঙ্গে বাক্‌চাতুরি কত্তে আসি নাই। উঠুন্—উঠুন্—টাকা দিন্।

কালাচাঁদ। যদি উঠিলেই টাকা মিলিত, তাহা হইলে, আমি এতক্ষণ দশহাত ঊর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিতাম।

মুদি। আপনি সোজা কথায় দিবেন কি না, বলুন?

কালাচাঁদ। আমি সোজা কথায়ও দিব না,—বাঁকা কথায়ও দিব না। বাপু! টাকা নাই,—কোথা থেকে দিব? তুমি রাগ করো না। টাকা হলেই পাঠিয়ে দিব।

কালাচাঁদ যত নরম সুরে, মিষ্টি করিয়া মুদিকে বুঝাইতেছেন,—মুদি তত চড়িয়া-চড়িয়া উঠিতেছে। চড়িয়া-চড়িয়া ক্রমশ অন্তিমে উঠিয়া, মুদি বলিল,—"ভদ্দরলোক ব'লে তোমাকে এতক্ষণ কিছু বলি নাই। তুমি জানো,—আমার নাম হরিহর মুদি? তুমি আজ টাকা না দিলে, গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় কর্‌বো—"

মুদি এত শক্ত কথা বলিলেও, কালাচাঁদের রাগ হইল না। কালাচাঁদ অধমর্ণ,—মুদি উত্তমর্ণ। মুদির এখন যা-খুসি-তাই বলিবার অধিকার আছে। ইহাই কালাচাঁদের ধারণা। এইরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাসে, তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের উদয় হইল না। তিনি ধীরভাবে মুদিকে কহিলেন, "বাপু! আজ তুমি আমার বুকে বসিয়া গলায় গামৃছা বাঁধিলেও, আমি কিছু বলিব না। কিন্তু গলায় গামৃছা দিলেই কি টাকা আদায় হইবে? আমাকে কাটিয়া দ্বিখণ্ড করিলেও, তোমার এক পয়সা আদায় হইবে না। আমার আছে কি?—যদি কিছু পিতল-কাঁসার জিনিসও থাকিত, তাহা হইলে, আজ তোমাকে তাহা দিয়া বিদায় করিতাম। মুদি! তোমাকে প্রকৃতই বলিতেছি, আমার কিছুই নাই। বরং তুমি আমার ঘর খুঁজিয়া দেখ—কিছু আছে কি না? আমি এই এক-বস্ত্র পরিয়া আছি, আমার দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। আর একখানি শতধাছিন্ন চাদর আছে। গঙ্গা-স্নানের পর, ঐ চাদরখানি পরিয়া,

আমার কাপড় শুখাইতে দি। একটী জল খাবার লোটা মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইচ্ছা হয়, তুমি লোটাটী লইয়া যাও। মুদি! আমার ভাত খাইবার থালা-পাথর নাই,—জল খাবার গেলাস-ঘটী নাই, পাতিয়া শুইবার বিছানা পর্য্যন্ত নাই। আছে, এক ছেঁড়া মাদুর, এক পিতলের লোটা, আর এই কাপড় এবং ঐ চাদরখানি। ইহার মধ্যে তুমি কি লইবে বল ?

মুদি "থ" হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন কালাচাঁদের কি যেন কথা একটা স্মরণ হইল ;—এইরূপ ভাব দেখাইয়া, তিনি দ্রুতগতিছন্দে বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—"ও হোঃ!—বড় মনে পড়েচে! একখানি তলোয়ার আছে, আমার কাছে। সেই তলোয়ারের নূতন বেলায় দাম ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার কম নহে। ভাল জিনিস। এক চোটে বাঘ বলি দেওয়া যেতে পারে। সেই তলোয়ারখানি পতিত নিয়ে রান্না-ঘরে, রেখে দিয়েচে। একটু ব'স্—ঐ রান্না-ঘরে আছে, শিগ্গির আন্‌চি আমি।

কালাচাঁদ তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া রন্ধনশালায় গেলেন। সেই চক্‌চকে তলোয়ার সবেগে ঘুরাইয়া আসিতে-আসিতে কালাচাঁদ বলিতে লাগিলেন, "মুদি! বড় সরেস্ তলোয়ার! খুব হাল্‌কা।—ইহা বেচে, তুমি—"

কালাচাঁদকে আর অধিক কথা কহিতে হইল না। কালাচাঁদের সেই ভীষণ কৃষ্ণমূর্ত্তি, তীক্ষ্ণধার তরবারির সেই উজ্জ্বলদ্যুতি—দেখিয়া মুদির প্রাণ উড়িয়া গেল। মুদি ভাবিল,—"কালাচাঁদের গলায় আমি গামছা দিব বলিয়াছি;—কালাচাঁদ, সেই রাগে, আমাকে খুন করিবার জন্য, কৌশলে এখানে বসাইয়া রাখিয়া, ঐ তলোয়ার আনিতেছে।" কালাচাঁদকে তদবস্থায় তলোয়ার ঘুরাইতে দেখিয়া, মুদি "বাপ্!—বাপ্‌রে!—মেরে ফেল্লেরে!"—রবে দৌড়িয়া পলাইল।

সেই তরবারি হস্তে করিয়া কালাচাঁদও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। মুখে উচ্চকণ্ঠে মুদিকে বলিতে লাগিলেন,—"ভয় কি? পালাও কেন?—

এ তলোয়ার বেচিলে, অন্তত তোমার পঁচিশ টাকা নিশ্চয় হবে—”

তখন সে কথা আর কে শুনে? মুদি প্রাণ-ভয়ে “বাপ্ বাপ্” ধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া ভীমবেগে দৌড়িল। কালাচাঁদ মুদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ খানিক গিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।
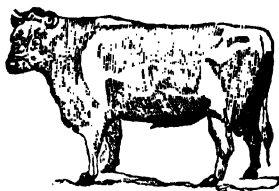
ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মুদি নিজ পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র করিল, "উঠ্‌নার টাকা চাহিতে যাওয়ায়, কালাচাঁদ তাহাকে কাটিতে আসিয়াছিল। তলোয়ার উঁচাইয়া পথ পর্য্যন্ত পেছু পেছু ছুটিয়াছিল।" এই কথায় সেদিন-সেরাত্রি সে পাড়াটি খুব গরম হইয়া রহিল।

অনতিবিলম্বে পতিতপাবনের কর্ণকুহরে এ কথা প্রবেশ করিল। পতিত তখন ঠাকুরদাদার গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে,—চড়কে তাঁহার নিকট টাকা বক্‌শীশ পাইয়াছে,—ভবিষ্যতে আরও অনেক টাকা পাইবার আশা করিয়া বসিয়া আছে।

কালাচাঁদ যে সম্বল-বিহীন, পতিত এখন তাহাও বুঝিয়াছে। কালাচাঁদের যে, সমস্তই ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড, তাহাও পতিতের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। পতিত, কালাচাঁদকে প্রত্যহ একসের করিয়া দুধ বিনামূল্যে খাইতে দিত। বলিত,—

"গো-দুগ্ধ বেচিতে নাই;—মূল্য কিছুতেই লইব না।" কালাচাঁদ, পতিতকে অন্যরূপে সে দুগ্ধের দামের দ্বিগুণ পোষাইয়া দিতেন। আজ প্রায় পনের দিন হইল, পতিত, কালাচাঁদকে সে দুগ্ধ দেওয়া বন্দ করিয়াছে।

ক্রমশ পতিতের ইচ্ছা হইল, কালাচাঁদ তাহার বাসায় আর না থাকেন। কিন্তু সে, ভয়ে একথা কিছুতেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না। কালা-চাঁদ যেরূপ গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক, তাহাতে তিনি যদি রাগিয়া উঠিয়া, পতিতকে একটা চড়াইয়া দেন,—ইহাই তাহার ভাবনা হইয়াছিল।

পয়সা-শূন্য কালাচাঁদকে তাড়াইবার জন্য, পতিত ঠাকুরদাদার সঙ্গে ক্রমে বেশী ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিল। ওদিকে যতবেশী ভাব হয়, এদিকে কালা-চাঁদের সঙ্গে তত ভাব কমে। এমন কি,—ক্রমশ কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

অদ্য তরবারি-ঘটিত ব্যাপার শুনিয়া পতিত বড়ই ভীত হইল। ভাবিল,—"কালাচাঁদের হাত

হইতে তলোয়ার খানি ভুলাইয়া লইবার উপায় কি?—আমি নিজে যাইয়া চাহিব কি? বাপ্! বাঘের মুখে কে যাবে? বাঘ কিন্তু আমার পোষা। আমাকে সে কিছুই বলে না। মুদির নিকট আগে একবার যাইয়া নিজের কাণে সকল কথা শোনাই উচিত।”

এইরূপ ভাবিয়া, পতিত, হরিহর মুদির দোকানে উপস্থিত হইল। দোকানে বসিয়া, পতিত প্রাণ ভরিয়া কালাচাঁদের নিন্দা আরাম্ভ করিল। সেই নিন্দাবাদ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, তাহার চতুর্দ্দিকে বহু লোক দাঁড়াইল। এই পৃথিবীমধ্যে কালাচাঁদের ন্যায় মন্দ লোক আর দ্বিতীয় নাই,—ইহাই পতিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় একজন লোক আসিয়া হরি মুদির হাতে একখানি পত্র,—এবং সেই তরবারি,—প্রদান করিল। পত্রলেখক কালাচাঁদ। পত্রে লিখিত আছে,—“তুমি বড় ভুল বুঝিয়াছ। পলাইলে কেন? তরবারি পাঠাইলাম। বেচিয়া

যাহা দাম হয়, লইও। অবশিষ্ট দেনা,—হাতে টাকা আসিলে, অগ্রে শোধ দিব।”

তরবারি দেখিয়া, পতিত চমকিয়া, লাফাইয়া উঠিল। ভাবিল,—“আমি তরবারির ভয়ে নিজের ঘর ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেচি,—কিন্তু তরবারি যে, আমাকে ছাড়ে না;—আমার সঙ্গে সঙ্গে এখানেও এসে পড়্‌লো। এস্থানে আর থাকা হবে না।”

তরবারির আগমনে পতিত তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উঠিয়া পড়িল। ভয়ে সেদিন আর আহার করিল না। কালাচাঁদের সহিতও সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। রাত্রে শুইয়া-শুইয়া কেবল ভাবিল,—“এ বাড়ী হইতে কালাচাঁদকে তাড়াইবার উপায় কি?”

তার পর যে ঘটনা ঘটে, তাহা পাঠক অবগত আছেন। ঠাকুরদাদার নিকট হইতে প্রশ্রয় পাইয়া, তাঁহার সাহসে সাহসী হইয়া, পতিত অর্দ্ধভুক্ত কালাচাঁদকে বেলা তৃতীয় প্রহরে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ করিল।

গৃহত্যাগের পর কালাচাঁদ যাহা যাহা করিলেন,—গঙ্গার ঘাটে বসিয়া যেরূপ ভাবিলেন; 'চুরি করায় দোষ নাই'—যেরূপে ঠিক করিলেন;—তাহা অবশ্যই সকলেরই মনে আছে। কিন্তু লাঠিদ্বারা কাছারির ঘাটের লণ্ঠন ভাঙ্গার পর, সে রাত্রি কালাচাঁদ যে, কোথায় কিরূপে অতিবাহিত করিলেন, তাহা পাঠক জানেন না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কোন প্রহরী জাগ্রত আছে কি-না,—ইহা পরীক্ষা করিবার জন্যই কালাচাঁদ লণ্ঠন ভগ্ন করেন। প্রহরী নয়ত—যেন ঠিক্ এক-একটী মূর্ত্তিমতী নিদ্রা। কুঞ্জর-পদতলদ্বারা মর্দ্দিত হইলেও, সহসা ইহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় কি-না সন্দেহ। ইহারা জাগিয়া থাকিবার জন্য মাহিনা পায়,—চোর ধরিবার জন্য মাহিনা পায়,—দুর্ব্বল ব্যক্তিকে প্রবলের উৎ-পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাহিনা পায়;—ইহারা মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে মাহিনাটী বেশ বুঝিয়া লয়,—কিন্তু কাজের বেলায় কেবল ঘুম,—মহাঘুম। যেটী করিতে নিষেধ, সেইটীই করে। ইহাদের ন্যায় বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি ত সংসারে আর দেখি না। ঠাস্ করিয়া গালে চড়ই—ইহার উপযুক্ত ঔষধ।

কালাচাঁদ সেই গভীর নিশীথে এইরূপ ভাবিতে

ভাবিতে ব্রাঞ্চ-স্কুল-ভবনের প্রাচীরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তখন প্রাচীর এত উচ্চ ছিল না। তিনি চ'কের বাজারের দিকে লোলুপ-দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ক্ষুধায় তাঁহার জঠর জ্বলিতেছে। মন "কিখাই, কিখাই"—করিতেছে। সম্মুখেই ভোলা ময়রার দোকান। কালাচাঁদ ভাবিলেন,—"এ দোকানে ত সবই আছে;—সন্দেস, মিঠাই, জিলিপি রসগোল্লা,—লুচি, কচুরি, নিমৃকি,—ক্ষীর, ছানা, মাখন—এ দোকানে নাই কি? ভোলানাথ প্রধান দোকানদার। হুগলীসহরস্থ প্রায় অধিকাংশ বড়লোকের বাড়ী ভোলানাথ মিষ্টান্ন যোগাইয়া থাকে। অবশ্যই এই দোকানে নানাবিধ মুখপ্রিয় সরস সামগ্রী আছে। দোকান-ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়া, উদরপূর্ণ করিয়া আহারাদিপূর্ব্বক একটু সুস্থ-শান্ত হই;—তারপর টাকা কড়ির চেষ্টা করা যাইবে।"

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ তথা হইতে উঠিলেন। ভোলা ময়রার দোকানে গিয়া চাবিতে হাত দিলেন। আবার ফিরিয়া আসিলেন। একটু

দাঁড়াইয়া, চকের বাজারের মধ্য-রাস্তা দিয়া খানিক উত্তরমুখে গেলেন। অনেকটা দূর গিয়া দেখিলেন,—একজন রাজ-প্রহরী বসিয়া-বসিয়া ঘুমাইতেছে, অনল্প নাসিকাধ্বনিও হইতেছে। মাঝে মাঝে তাহার মাথা ঢলিয়া-ঢলিয়া পড়িতেছে; নিদ্রিত অবস্থাতেই সে আবার মাথাটী ঠিক সোজাভাবে রাখিতেছে। কালাচাঁদ প্রায় পাঁচ মিনিটকাল দাঁড়াইয়া, প্রহরীর সেই অপূর্ব্বভাব, নয়ন ভরিয়া অবলোকন করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"ওঃ, অভ্যাসের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! এই লোকটা ঘোর-নিদ্রায় অভিভূত,—অথচ ঠিক সোজা হইয়া বসিয়া আছে,—মাথা টলিয়া পড়িতেছে, অথচ নিদ্রিতাবস্থাতেই আবার তাহা তুলিয়া সোজা করিতেছে। কর্ম্মে সুদক্ষ বটে! বোধ হয়, এ ব্যক্তি এই নাসিকা-ধ্বনিদ্বারা কোম্পানীর লুন খাওয়ার গুণ গাহিতেছে। ওহে কনষ্টেবল-সাহেব! তোষক বালিস আনিয়া দিব কি? বসিয়া থাকিতে কষ্ট হইতেছে না ত?"

কালাচাঁদ তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় ভোলাময়রার দোকানের নিকট আসিলেন। আবার চাবিতে হাত দিলেন। আবার ফিরিলেন। ঠিক্ চৌমাথার মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে অন্তরের কথা আপন মনে কহিতে লাগিলেন,— "ভোলানাথ! আমার অপরাধ লইও না। আমি চোর হইয়াছি। চুরি-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছি। এ ব্যবসা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুচারুমতে চালাইতে পারিলে, আমি ইহা দ্বারা সহজেই রাজা হইতে পারিব। আজ যাহা তোমার দোকান হইতে লইব,—রাজা হইয়া তাহার মূল্য আমি সুদ-সুদ্ধ শোধ দিব। ভাই! কিছু মনে করিও না। আর, তোমার মনেই বা বিশেষ কষ্টানুভব হইবে কেন? তোমারও ত অধিকাংশ চোরাই মাল! তুমি সর্ষপ-তৈলে জিলিপি ভাজিয়া অনেক লোককেই তাহা ঘৃত-পক্ব বলিয়া বিক্রয় কর। একসের সন্দেস কেহ কিনিতে আসিলে, তাহাকে ভুলাইয়া চৌদ্দ ছটাক দাও। তোমার ঘরে বাটখারা তিন রকম আছে। এক রকম, ঠিক

ওজন,—একসের। ২য় রকম, কম ওজন,—১৫ ছটাক। ৩য় রকম বেশী ওজন,—১৭ ছটাক। কোন জিনিস যখন তুমি অন্যের নিকট হইতে মাপিয়া লও,—তখন সেই ১৭ ছটাককেই সের বল। তুমি অন্যকে যখন কোন জিনিস বিক্রয় কর, তখন সেই ১৫ ছটাককেই সের বল। যদি কখন ধরাধরি, কড়াকড়ি হয়,—তুমি এই ভয়ে ঘরে ঐ ষোল ছটাকের সেরটী রাখিয়া দিয়াছ। তুমিও ত ভাই! চোর। তবে আর আমার উপর রাগ করিবে কেন? তুমি হইলে, ক্ষুদ্র-চোর, উঞ্ছ-চোর,—আমি হইলাম, চোর-রাজ! প্রধান সেনাপতির নিকট সামান্য পদাতি যেরূপ, আমার নিকট তুমিও সেই-রূপ। ফল কথা,—উভয়ের বৃত্তি একই। সে যাহাই হউক,—ভাই! তুমি মনে কিছু দুঃখ করিও না। তোমার দোকানে মিষ্টান্নের মধ্যে যাহা কিছু আমার ভাল লাগিবে, তাহাই আমি খাইব;—যত পারিব, উদর পূরিয়া ততই খাইব। ভাই! মনে কিছু করিও না। তোমার দোকানে নগদ যদি টাকা

পাই,—তাহাও লইব। বেশী লইব না,—আবশ্যক মত লইব। ভাই! মনে কিছু করিও না। যতশীঘ্র পারি, তোমার টাকা শোধ দিব। আজ আমার ক্ষুধা প্রবলা। আর থাকিতে পারিতেছি না। গা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। ভাই! ভোলা নাথ! চাবি ভাঙ্গিতে চলিলাম,—কিছু মনে করিও না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ পুনরায় চাবিতে হাত দিলেন। একবার চাবিটী নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন। দক্ষিণ হস্তের দৃঢ়-মুষ্টিতে চাবি ধরিলেন। ধরিয়া, এদিক-ওদিক চাহিলেন। তারপর, অমনি চাবিতে এক মোচড়! সুর্‌সা সহিত চাবি ভাঙ্গিয়া কালাচাঁদের হাতে আসিল। ভগ্ন-চাবি কালাচাঁদ নর্দ্দমায় ফেলিলেন।

কালাচাঁদ সন্দেসের ঘরে ঢুকিলেন। ঘর অন্ধকার। কোথায় কোন্ দ্রব্য আছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বিলাতী দেশ্‌লাই থাকিলে, এ সময় কালাচাঁদের সুবিধা হইত। কিন্তু তখন এ দেশে বিলাতী-দেশ্‌লায়ের এরূপ ভাবে আমদানি হয় নাই। তখন ব্যবস্থা ছিল—চক্‌মকির। 'ইস্পাত' দিয়া ঠুক্ করিয়া চক্‌মকির পাথর একবার ঠুকিলেই সোলায় আগুন পড়িত। সেই

সোলায়, টীকা বা কয়লা ধরাইতে হইত। টীকা ধরিলে, দিশি-দেশ্‌লায়ের সাহায্যে প্রদীপ জ্বালা হইত।

কালাচাঁদ নূতন ব্রতী। চৌর্য্য-কার্য্যে নিতান্ত নূতন ব্রতী না হইলেও, এরূপ চাবি ভাঙ্গিয়া রাত্রিকালে চৌর্য্য-কার্য্যে নূতন ব্রতী বটেন। তিনি জানিতেন না যে, চোরের সঙ্গে অগ্নি থাকা একান্ত আবশ্যক। অনভিজ্ঞ বলিয়াই,—তিনি অগ্নি বা কোনরূপ আলোক, সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। বলাবাহুল্য, তিনি এ বিষয়ে কোন 'খেয়াল' করেন নাই,—ঘর খুলিলেই রসগোল্লা,—ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল;—কিন্তু ঘর খুলিলেই যে, অন্ধকার,—ইহা তিনি ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

সুবিধার মধ্যে, তখনও থাকিয়া থাকিয়া এক একবার ঈষৎ বিদ্যুৎ চমকিতে ছিল। যদি মেঘে মেঘে ঘোরতর সংঘর্ষণ হইয়া, এ সময় ভীষণা চপলা চমকিয়া বজ্রাঘাতও হইত, তাহা হইলে কালাচাঁদের আরও সুবিধা ঘটিত। কেন না, তিনি

এখন চাহেন—অধিক আলোক!—তা, বজ্রাঘাতও না-জানি, মহাপ্রলয়ও না-জানি!

দুঃখ এই, বজ্রাঘাত হইল না;—মেঘের কোলে বসিয়া সৌদামিনী মাঝে মাঝে কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। মন্দের ভাল বটে। কালাচাঁদের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইল। অদূরে চক্‌মকি নজর হইল। পাথর, সোলা, ইস্পাত, কয়লা—সমস্তই তিনি আভাসে দেখিতে পাইলেন। গুড়ি মারিয়া যাইয়া, তিনি হাতড়াইয়া চক্‌মকি ধরিলেন। ধরিয়া, ভাবিলেন,—লাভ যে কিছুই হইল না দেখিতেছি। চক্‌মকি ঠুকিব কেমন করিয়া? ঠুকিলেই যে, শব্দ হইবে। রাত্রিকালে, চোর চুরি করিতে আসিয়া, গৃহস্থের গৃহে বসিয়া চক্‌মকি ঠুকিবে কেমন করিয়া? আর, এই ঘরের দ্বারইবা কতক্ষণ খোলা রাখিব? দরজা এখনি বন্ধ করিয়া দেওয়াই উচিত! কিজানি যদি কোন পথিক এপথ দিয়া চলিয়া যায়,—তাহা হইলেত আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। ধরিতে অবশ্যই পারিবে না। তবে আহারটা হইবে না—এইমাত্র।

কিন্তু দরজা বন্ধ করিয়া দিলেত,—ঘরটী ঘোর অন্ধকারময় হইবে। আমি এই আঁধার রাশির মধ্যে একা নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াইবা কি করিব?

চক্‌মকিও ঠোকা হইবে না, দরজাও বন্দ করিতে হইবে,—অথচ চাই আলোক। এ-মহা সমস্যার কেমন করিয়া মীমাংসা করিব?

আচ্ছা, হাঁড়িগুলা হাতড়াইয়া দেখি না কেন? মিষ্টান্নপূর্ণ একটা হাঁড়ি পাইলেই আমার যথেষ্ট হইবে।

কিন্তু এক ভয়। কোথায় কি আছে, কিছুই জানি না। কোন্ জিনিস কিরূপ ভাবে সাজান আছে, তাহাও অবগত নহি। যদি হাতড়াইতে-হাতড়াইতে হাঁড়িগুলা হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যায়—তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ। অথবা অন্ধকারে আমি যদি রসের ডাবার ভিতর দূম্ করিয়া পড়িয়া যাই,—তাহা হইলে, সে-ও এক কম ব্যাপার হইবে না।

আরও এক বিষম অভাব দেখিতেছি যে! তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। জল কোথা পাই? আগে জল চাই! সুধু সন্দেস লইয়া কি করিব? সন্দেসগুলা খাইলে ত আরও অধিক পিপাসা পাইবে। সন্দেসইবা গলাধঃকরণ হইবে কেন?

কালাচাঁদ কাতর হইলেন। এসময় কি যে করিবেন,—তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন,—বাহির হইতে একটা আলোর যোগাড় করিয়া আনি না কেন? কিন্তু এরাত্রে আলোক কোথায় পাইব? গৃহস্থকে গিয়া কি বলিব,—'অগো! আমার চুরির ভাল সুবিধা হইতেছে না, তোমরা একটা আলো দাও?' তাও কি কখন হয়?—আর, এরূপ যোগাড়যন্ত্র করিতেই যে, রাত পোহাইয়া যাইবে।

ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাতুর কালাচাঁদ বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন,—এমন সময় আবার সৌদামিনী ঝলসিল। কালাচাঁদ দেখিলেন, তাঁহার ঠিক বামপার্শ্বেই উনান। উনানে আগুন

নাইত?—একটুও কি আগুন থাকিবে না? কালাচাঁদ বসিলেন। উনানের ভিতর হাত দিলেন। কৈ উনান-ত বেশী গরম নয়? তবে কি হতভাগার অদৃষ্টে কিছুতেই আজ আগুন মিলিবে না? বোধ হয়, আমি মরিলে, আজ আমার মুখাগ্নিরও আগুন পাওয়া যায় না।

কালাচাঁদ অদ্য অদৃষ্টবাদী, পরকালবাদী না হইলেও, এ অন্তিমে, মনভ্রমে,—অভ্যাস নিবন্ধন—ভাগ্যের কথা, অদৃষ্টের কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অন্তিমকাল বড় কঠিনকাল।

কালাচাঁদ এইরূপ ভাবিতেছেন, আর উভয় হস্তদ্বারা উনান হইতে পাঁশ তুলিয়া বাহিরে রাখিতেছেন। সর্ব্বাঙ্গ পাঁশে আচ্ছাদিত হইল। নাকে, মুখে, চোখে পাঁশ প্রবেশ করিল। তথাচ কর্ম্মে তাঁহার অবহেলা নাই। একাগ্রমনে যোগীপুরুষের ন্যায়, তিনি পাঁশ-বহিষ্করণ-কার্য্যে নিযুক্তই হইয়া রহিলেন।

হঠাৎ কালাচাঁদের হাতে গরম ঠেকিল। অমনি আনন্দে তাঁহার মন লাফাইয়া উঠিল। মনে মনে মহোল্লাসে বলিলেন "পেয়েছি, পেয়েছি!—আগুন নিশ্চয় আছে। আর ভাবনা কি?" ধীরে ধীরে অতি যত্নের সহিত, তাঁহার অগ্নিতে তিনি হাত দিলেন। অগ্নি এখন প্রাণের ন্যায় প্রিয়মত বস্তু,—সুতরাং হাত দিয়া সেই অমূল্য অগ্নিকে টিপিয়া ধরিতে তাঁহার কষ্টবোধ হইল না। হাতে যে 'জ্বালা' লাগিতে লাগিল, তাহা তিনি তাদৃশ অনুভব করিতে পারিলেন না। এখন জ্বালাও মিষ্টি!

কালাচাঁদ সেই অগ্নিকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। কিন্তু সেই ঘোর অন্ধকারে সেই অগ্নির ত কোনরূপ আলোক দীপ্তি পাইল না। কালাচাঁদ ফুঁদিতে লাগিলেন। তাহাতেও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল না। সেই অগ্নি, উনানের ভিতরে যত গরম ছিল, বাহিরে আনা হইলে, সে, আর তত গরম রহিল না। কালাচাঁদ তখন

দু-ই হাতে করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন,—অনুভবে স্পষ্টত বুঝিলেন,—"ইহা আগুন নহে,—একটা লোহা-ভাঙ্গা। বোধ হয় কড়া-ভাঙ্গা হইবে। উনানে কখন্ হয়ত পড়িয়া গিয়া থাকিবে।"

ক্রোধে কালাচাঁদ সেই উত্তপ্ত ভগ্ন লৌহখণ্ডকে নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার সহিত বড়ই প্রবঞ্চনা করিয়াছ। তুমি নর্দ্দমা-রূপ নরকে গিয়া বারমাস বাস কর।"

কেহ যদি নৈরাশ্যের জীবন্ত ছবি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি এইবার—শীঘ্র কালাচাঁদের মূর্ত্তি অবলোকন করুন। হস্ত-পদ শিথিল, নিস্পন্দ নয়ন,—মুখটী যেন গুটাইয়া গিয়াছে,—কোমরে যেন কে লাঠীর আঘাত করিয়াছে,—চোখের কোল বসিয়াছে, চড়াইয়া কে যেন গালটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—সর্ব্ব-শরীর চুপ্‌সিয়া গিয়াছে। যদি কাহারও সাধ থাকে, তবে এই বেলা এ ছবি দেখিয়া লউন।

কিন্তু অধিকক্ষণ এ ভাব রহিল না। দেখিতে

দেখিতে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। কালাচাঁদ ক্রমশ বল পাইয়া যেন একটু সুস্থ হইলেন।

কালাচাঁদ ভাবিলেন, "লোহ-খণ্ডটা যখন প্রথমে খুব গরম ছিল, তখন নিশ্চয়ই উনানের ভিতর আগুন আছে। আগুন না থাকিলে, লোহাটা এরূপ গরম থাকিবে কেন? উনান-মধ্যে গণ্‌গণে আঙরা অবশ্যই নাই। তবে পাঁশের ভিতর একটু-আধটু অগ্নি বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অবশ্যই আছে। আর পাঁশ বাহির করা হইবে না,—ঘাঁটাঘাঁটিতে, যে আগুন-টী এখনও আছে, তাহা নিবিয়া যাইতে পারে। চকমকীর সোলা ও টীকা সংগ্রহ করা—অগ্রে আবশ্যক।"

কালাচাঁদ তখন বামহস্তে টীকা ও সোলা রাখিলেন। মুখটী ঠিক উনানের মুখে দিলেন। ডানহাতটী উনানের ভিতর ঢুকাইয়া আগুন খুঁজিতে লাগিলেন।

আবার হাতে গরম ঠেকিল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গও দৃষ্ট হইল। কালাচাঁদের হৃদয়ে আবার হর্ষোদয় হইল।

সত্যসত্যই এবার কালাচাঁদ সোলা ধরাইলেন। সোলার অগ্নি টীকায় আসিল। কালাচাঁদ হাসিয়া ভাবিলেন,—"আগে, একবার তামাক খাইলে হয় না?"

উনানের পাশেই ঘিয়ের কড়াই ছিল। তাহাতে ঘি কিছুই ছিল না,—তবে কড়াইটা ঘি মাখান বটে। কালাচাঁদ আপনার কাপড়ের কোঁচার দিক্‌টা খানিক ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন কাপড়টুক্‌ ঘিয়ের কড়ায় বারকয়েক বুলাইলেন। কাপড় বেশ ঘৃতাক্ত হইলে, তাঁহার লাঠীর মুখে সেই কাপড় বাঁধিলেন। দিব্য মশালের মত হইল। কালাচাঁদ কৌশলে তখন টীকা ও সোলার সাহায্যে তাহাতে আগুন জ্বালিয়া দিলেন। বেশ আলো হইল।

বলা বাহুল্য, ইতিপূর্ব্বেই তিনি সদর-দরজা বন্দ করিয়াছিলেন। আলোক জ্বালা হইলে ভাবিলেন, আগে খিড়কীর দরজাটা খুলিয়া রাখিয়া আসা উচিত। তিনি তখন সেই জ্বলন্ত মশাল লইয়া, দোকান ঘরের চারিদিক্‌ দেখিতে দেখিতে

চলিলেন। প্রথম ঘর পার হইয়া আর একটী ঘরে পড়িলেন। সেই দ্বিতীয় ঘরের সম্মুখেই একটী ক্ষুদ্র উঠান। সেই উঠানে এক কূপ। কূপের নিকট জল তুলিবার দড়ী এবং ঘটী।

কালাচাঁদের স্নান করিবার সাধ হইল। মশাল-টীকে ঘরের এককোণে তখন লুকাইয়া রাখিলেন। উল্লাসে কূপের নিকট স্নান করিতে বসিলেন। ধীরে ধীরে জল তুলিয়া প্রায় বিশ ঘটী জল মাথায় দিলেন। অঙ্গের মলা দূর করিলেন। স্নানে যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। নবজীবন পাইয়া, কালাচাঁদ খিড়কী-দ্বারের খিল খোলা তত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না!

স্নানান্তে ভাবিলেন, "একটু নেবুর সরবৎ পাই ত খাই।" নেবু মিলিল না, কিন্তু তিনি বাতাসা ভিজাইয়া সরবৎ করিয়া খাইলেন।

তারপর দুইখানি কম্বলাসন যুড়িয়া পাতিলেন। বৃহৎ একখুলি রসগোল্লা আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। এক ধামা সন্দেস এবং এক হাঁড়ী ক্ষীর আনিলেন।

এত উদ্যোগের পর কার্য্যারম্ভ। কালাচাঁদ প্রথমত সেই পাতলা ক্ষীর এক হাঁড়ী খাইয়া গলাটা সরল করিয়া লইলেন। তারপর রসগোল্লার বড় খুলিখানা সম্মুখে আরও একটু সরাইয়া আনিয়া, টপাটপ্ সপাসপ্-রূপে শীঘ্রহস্তে শুভকার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। রসেভরা বড় বড় রসগোল্লা এক একটী করিয়া মুখে এই ফেলেন, আর এই নাই! আবার মুখে ফেলেন,—তখনই মুখে আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। যেন যাদুমন্ত্রে রসগোল্লাগুলা উড়িয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার দক্ষিণ-কর মুখ-গহ্বরে রসগোল্লা নিক্ষেপ-কার্য্যে যেরূপ তৎপর, মুখ-গহ্বরও তাহাকে উদর-রসাতলে পাঠাইতে সেইরূপ, বা তদপেক্ষা অধিক তৎপর।

কালাচাঁদের প্রাণ কঠিন হইলেও, তিনি এক একবার চমকিতে লাগিলেন। ব্যবসার অদ্য প্রথম আরম্ভ,—হাতে-খড়ি,—তাই বুঝি এক একবার হাত কাঁপিতে লাগিল।

এসব কার্য্যে কালাচাঁদের অভ্যাস ত বেশী

কালাচাঁদের রসগোল্লাভক্ষণ।
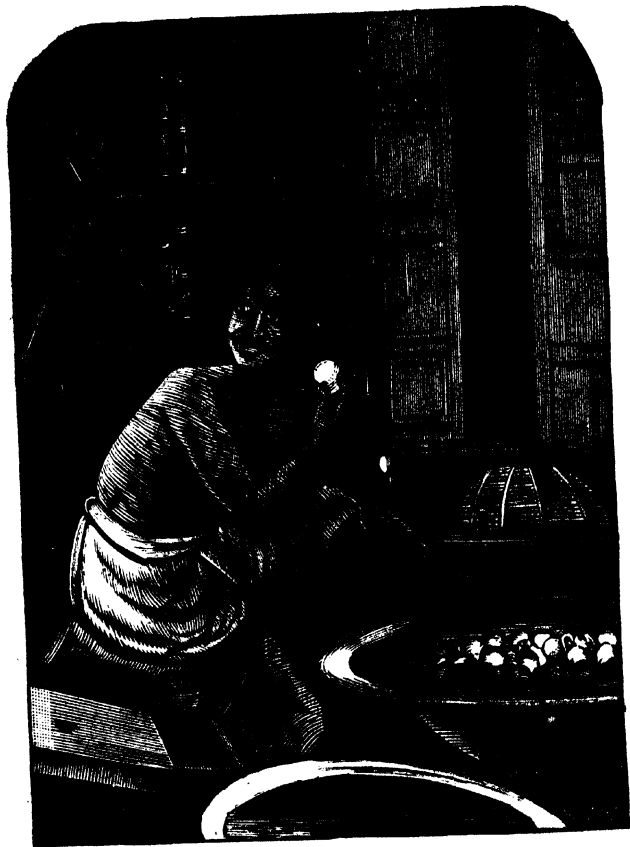
নাই,—কোথায় একটী ইন্দুর নড়ে;—তিনি মনে করেন, ভোলাময়রা বুঝি আসিতেছে। বাদুড় উড়িয়া যায়, তিনি মনে করেন, তাঁহাকে বুঝি কে ডাকিতেছে!

যে কারণেই হউক, কালাচাঁদ সমুদায় রসগোল্লা খাইলেন না। যতগুলি খাইলে, রাত্রির ক্ষুধা সহজভাবে নিবৃত্তি পায়, ততগুলিই উদরস্থ করিলেন।

রসগোল্লা ভক্ষণ-কার্য্য প্রথমত যেন ডাকগাড়ীর বেগে আরম্ভ হইয়াছিল,—কিন্তু হঠাৎ সে বেগ নরম হইল। যেন গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভীম ভৈরব বেগ যদি আর অর্দ্ধদণ্ডকাল থাকিত, তাহা হইলে আধখানি রসগোল্লাও পড়িয়া থাকিত কি না সন্দেহ,—খুলিখানি পর্য্যন্ত থাকিত কি না, তাহাতেও কিঞ্চিৎ সন্দেহ!!

কালাচাঁদ রসগোল্লার পর সন্দেস ধরিলেন। দুইটী সন্দেস মুখে দিয়া বলিলেন,—"ভোলানাথ! একটু দই দিতে পার? তোমার যদি দই নাই, তবে সন্দেস খাবো কেমন ক'রে? এমন নিমন্ত্রণ

করা কেন? দূর কর! আর খাবো না!—এই রাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। দাও, ভোলাবেটার ক্ষীরের হাঁড়ি ভেঙ্গে।”

ক্ষীর-ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া কালাচাঁদ ভোলানাথের বাক্স ভাঙ্গিলেন। বাক্সে অনেকগুলি টাকা থাকিলেও, আটটী টাকা, তিনটী সিকি এবং চারিগণ্ডা পয়সা ব্যতীত আর কিছুই লইলেন না।

আপন জিনিসপত্র সমস্ত বুঝিয়া লইয়া, কালাচাঁদ ভিজা কাপড়ে ভোলানাথের দোকান-ঘর পরিত্যাগ করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদের দশগুণ বল বৃদ্ধি হইল। ব্যবসারম্ভের প্রথম দিনেই প্রচুর ফললাভ,—কালাচাঁদের বলবৃদ্ধি হইবে-না’ ত কি? আজ নবীন সেনাপতি প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিল,—আনন্দ-উল্লাসের কি আর অবধি আছে?

ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল,—ক্লান্তি দূর হইল,—হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল,—কালাচাঁদ গজেন্দ্র-গমনে পুনরায় সেই কাছারির ঘাটে গেলেন। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ঘাটের যে পৈঠায় বসিয়া পাপ-পুণ্য, চোর-সাধু, সত্য-মিথ্যার বিষয় ভাবিয়াছিলেন,—যেস্থলে বসিয়া তিনি ‘চুরি-করায় দোষ নাই’—এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন;—কালাচাঁদ গিয়া ঠিক সেই-খানেই বসিলেন। এক প্রহর পূর্ব্বে যেখানে বসিয়া কত অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এখন

সেখানে বসিয়া পরমসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। আগে ছিল, সংসার তাঁহার পর; এখন হইল, সংসার তাঁহার আপনার। এই বিশ্বসংসারের সমগ্র পর-দ্রব্য তাঁহার আপনার হইল। অহ্লাদ-সলিলের নদী না বহিবে কেন?

কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন,—"কোম্পানীর এই কালেক্‌টরীতে যত-লক্ষ টাকা আছে,—সমস্ত আমারই; কেবল কৌশলে লইতে পারিলেই হইল। ব্রজনাথ বড়াল, এক আনা, দুই আনা সুদে টাকা ধার দিয়া,—এখন কোটীপতি; তাহার নিকট হইতে অন্তত পাঁচ আনা ভাগ চাহিব;—না দেয়, বুদ্ধির জোরে কাড়িয়া লইব। এ অঞ্চলে যত লোক আছে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে, অবস্থা-নুসারে ৫৲, ১০৲, ২৫৲, ১০০৲—অধিক কি, এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত 'চৌথ' আদায় করিব। আমার টাকার অভাব কি? যদি তেমন কিছু অভাব হয়,—তবে একদিন ঠাকুরদাদার লোহার সিন্দুকটা মাথায় করিয়া তুলিয়া আনিলেই চলিবে। লোকে

বলে, সে সিন্দুকটা মোহরে ভরা! সেই এক সিন্দুকেই বস্ আছে।”

দরিদ্র কালাচাঁদ, এক এক মুহূর্ত্তে হৃদয়ভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া ফেলিতেছেন! আহ্লাদ-সলিলের নদী ত কোন্ সামান্য কথা,—গভীর গর্জ্জনকারী সমুদ্রইবা প্রবাহিত না হইবে কেন?

কোন্ কৌশল, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, আমার এ ব্যবসা চলে ভাল?—ইহাই হইল এখন কালাচাঁদের সুচিন্তা। ছিঁচ্‌কে চোর হইলে, কোন কাজ হইবে না; ব্যবসা শীঘ্র ফলাও করিয়া দিগ্বিজয় হইয়া উঠিতে হইবে। এই হুগলী-সহরের মধ্যে প্রধান পুরুষ, অর্থাৎ প্রধান চোর কে? প্রথমত মহতের আশ্রয় না লইলেত শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার হইবে না। তাই বলি, মহৎ কে? যদি এ সংসারে কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুমহৎ ব্যক্তি থাকেন, তবে তিনি আমার ঠাকুর-দাদা। তাঁহার যোড়া নাই। একবারে চৌকস্। খাঁটি সোণা। এ ব্যবসা চালা-

হইতে হইলে, প্রথমত তাঁহারই আশ্রয় লওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সেখানে শিক্ষা, দীক্ষা, পরীক্ষা—সবই হইবে। তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিলে, আমার সম্মান-গৌরব বৃদ্ধি হইবে; দু-দশজন লোক আমাকে মান্য করিয়া চলিবে। পসার বৃদ্ধি হইবে। পসার বাড়িলেই পরম লাভ। এখন তবে ঠাকুর-দাদার কাছে গিয়া শ্রীচরণে প্রণিপাত হওয়াই সুযুক্তি।”

“কিন্তু বুড়াকে বশ করিব কেমন করিয়া? বুড়া যে, আমার উপর হাড়ে চটা! আমাকে দেখিলেই, তাঁহার যেন গায়ে জ্বর আসে! এমন অচল অটল বিষম বিষধরকে কোন্ মন্ত্রৌষধ গুণে নতশির করিব?

“বৃদ্ধ বোধ হয় এইরূপ ভাবেন, যে,—‘আমি মরিলেই তাঁহার যেন আপদ যায়; সংসার জুড়ায়; কালো মেঘ দূরে পলায়।’ তাঁহার অন্তরের এরূপ ভাব না হইলে, আমাকে জেলে পাঠাইবার জন্য তিনি এত চেষ্টা কেন করিবেন? নীচের আশ্রয়ে, নাপিতবাড়ী আমি অবস্থিতি করিতেছি জানিয়াও,

---

তিনি আমার কোন্ অপরাধে আমাকে একবার ডাকিলেন না? অপরাধ ত কিছুই দেখি না!—অপরাধের মধ্যে বোধ হয়,—আমি তাঁর 'আপদ-বালাই!' আমি যখন তাঁর আপদ-বিপদের মধ্যে গণ্য,—তখন অবশ্যই তিনি আমাকে ভয় করেন। যে দিন আমি তাঁহার সহিত এখানে সাক্ষাৎ করি, সে দিনও তাঁহার মুখে যেন একটু ভয়ের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। ইহাইত আমার ধারণা। আমার উপর বিরক্ত হইয়া তিনি ভালরূপ কথা কহিলেন না বটে,—কিন্তু তখন ভয়ে যেন তাঁহার বুক ধুক্-ধুক্ করিতেছিল। মুখেই মনের ভাব মাখানো থাকে। ঠাকুরদাদার সেই মুখটীতে তখনত কেবল বিরক্তি ভাব প্রকাশিত ছিল না,—ভয়ের ভাবও বিলক্ষণ ছিল। নহিলে, আমাকে দেখিয়াই চক্ষুদ্বয় ওরূপ বিস্তৃত হইবে কেন? কপালে ওরূপ রেখা অঙ্কিত হইবে কেন? মাথার চুল অমন সোজা হইবে কেন? শরীর অমন কণ্টকিত হইবে কেন? ভয় বটে!

কিন্তু আমাকে তাঁহার কেন ভয়? কিসের ভয়? কবে থেকে ভয়?—তাহাত কিছুই খুঁজিয়াও পাই না, বুঝিতেও পারি না। আমি দরিদ্র, অক্ষম কালাচাঁদ; তিনি ধনবান, সক্ষম ঠাকুরদাদা। আমার উপর তাঁহার ভয় কি কারণে হইবে?

কারণ যাহাই হউক, কার্য্য ঠিক বটে। যদি সত্য সত্যই আমি তাঁহার কোনরূপ ভীতি-সঞ্চারের কারণ হই, তাহা হইলে ত আমি তাঁহাকে এক-মুহূর্ত্তেই বশ করিয়া লইব।

কিন্তু আমার এই অনুমান যদি অমূলক হয়, তাহা হইলে বুড়াকে বশে আনা বড়ই কঠিন হইবে। সে যাহাই হউক, এখন স্বকর্ম্ম সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা-যত্ন করিব,—তাহাতে অবশ্যই কার্য্যোদ্ধার হইবে। চেষ্টার অসাধ্য কোন্ কার্য্য আছে?

ঠাকুরদাদার বাসায় থাকিব। ঠাকুরদাদার প্রিয়-পাত্র হইব। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। উঠিতে বলিলে, উঠিব; বসিতে বলিলে, বসিব।

তাঁহার গোলাম হইব। মধুর কথারূপ মহাস্ত্রে তাঁহার মন চুরি করিয়া লইব। এবং তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারই অর্থ অপহরণ করিব। তবে তাঁহার নিকট হইতে দু-চারি টাকা খুচুরা হিসাবে কখন লইব না;—উপযুক্তকালে একবারে থান্ চুরি, গাঁট চুরি, গুদাম চুরি করিব!

আচ্ছা,—ঠাকুরদাদার সঙ্গে এক বাসায় থাকা সুবিধা হইবে কি? যাউক্—এ সব ক্ষুদ্র কথা! উপস্থিত মত, তখন যেমন দেখিব, সেইরূপই বন্দোবস্ত করিব। ফল কথা,—ঠাকুরদাদাকে আয়ত্তের মধ্যে, হাতের মুঠার ভিতর আনিতেই হইবে।”

দেখিতে দেখিতে রাত্রি চারিটা বাজিল। একজন প্রহরীর তখন ঘুম ভাঙ্গিল। সে, কাছারির ঘাটের দিকে আসিয়া, কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসিল, “কৌন্ হ্যায়?”

কালাচাঁদ। হাম, চৈতন্যচরণ চূড়ামণি হ্যায়!

প্রহরী। মকান্ কাহাঁ?

কালাচাঁদ। মকান্ তো—ঘুঘু-ডাঙ্গামে হ্যায়।

প্রহরী। কাঁহা যাতে হেঁ।

কালাচাঁদ। নবদ্বীপ-কা শ্রীপাটমে।

প্রহরী। রাতমে আপকো বহুত তক্‌লীফ হুয়া।

কালাচাঁদ। কনষ্টেবল সাহেব! সে কথা, কি আর বল্‌বো? বাপু! তামাক খাবার কোন যোগাড় আছে কি?

প্রহরী। থোড়ি তামাকু হ্যায়। লেকিন টীকিয়াভি নহীঁ,—আগ্‌ভি নহীঁ!

কালাচাঁদ। ওহে বাপু! এত ভাব্‌চো কেন? এই দুইটী পয়সা নাও। এক পয়সার তামাক এবং এক পয়সার আগুন কিনে নিয়ে এস।

প্রহরী পয়সা লইল। অবিলম্বে তামাক সাজিয়া আনিল। হুঁকা ছিল না। অশ্বত্থপত্রের নল তৈয়ারি হইল। কালাচাঁদ সেই নলে তামাক খাইতে লাগিলেন। কল্‌কে ফিরাইয়া দিবার সময় কালাচাঁদ প্রহরীকে আরও দুইটী পয়সা দিলেন। প্রহরী কৃতার্থ হইয়া চলিয়া গেল।

কালাচাঁদ তখন তাঁহার লোটাটী গঙ্গাগর্ভে প্রোথিত করিলেন। লাঠিটী সেই বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর লুকাইয়া রাখিলেন। নিজস্ব অস্ত্র-শস্ত্র এবং ধন-সম্পত্তি এইরূপে রক্ষা করিয়া, কালাচাঁদ দ্রুতপদে চুঁচুড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চুঁচুড়া পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরেই অরুণোদয় হইল। পাখীকুল কলকণ্ঠে কোলাহল করিয়া উঠিল। দোকানদার দোকান খুলিল। কালাচাঁদ এক ধূতি এবং এক চাদর কিনিলেন। গলিমধ্যে গিয়া গোপনে ছেঁড়া কাপড় ছাড়িয়া, নূতন কাপড় পরিলেন। তিনি সেই সু-ছিন্ন বসনখানি ফেলিলেন না,—একটা প'ড়ো-বাড়ীর পরলে লুকাইয়া রাখিলেন।

তারপর—বাজার। মাছ, দই, সন্দেস, আলু, বেগুন, কলা খরিদ। তারপর এই ভেট-উপহার লইয়া, মাছ হাতে করিয়া, ঠাকুরদাদার গৃহে কালাচাঁদের আগমন; এবং সম্ভাষণ,—"দাদা মোশাই! অ, দাদা মোশাই! বাড়ীতে আছেন কি?"

অবশেষে কালাচাঁদের সেই স্নান এবং সেই আহার,—অর্থাৎ ভূরি-ভোজন।

ইহাই হইল—ইতিহাস।

প্রথম অংশের উপসংহার।

বৃদ্ধ হরিতারণ দত্ত, ভাবিয়া চিন্তিয়া, কালাচাঁদকে হস্তগত করাই উচিত বিবেচনা করিলেন। তিনি কালাচাঁদকে উত্তম আশ্রয় দিলেন,—কিন্তু নিজের বাসায় রাখিলেন না। স্বতন্ত্র বাসায় থাকিতে কালাচাঁদ সানন্দে সহজেই সম্মত হইলেন। ঠাকুরমা কিন্তু প্রথমে কালাচাঁদের স্বতন্ত্র বাসা-স্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করেন। অবশেষে ঠাকুরদাদার বিনয়-বিতর্কে এবং কালা-চাঁদের সম্মতিতে, ঠাকুরমার আপত্তি-খণ্ডন হইয়া যায়। নাতী-ঠাকুরদাদা উভয়েরই মন্ত্রণা সফলতা লাভ করিল। আপন আপন ইষ্টসিদ্ধিতে উভয়েরই সংসার এখন সুখময় হইল।

ফুল ফুটিল। সৌরভ ছুটিল। দশ দিক হাসিল। পরমসুখে কালাচাঁদের বিষম ব্যবসা আরম্ভ হইল। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস।

চতুর্থ পর্ব্ব সমাপ্ত।

কালাচাঁদ।
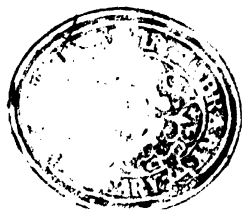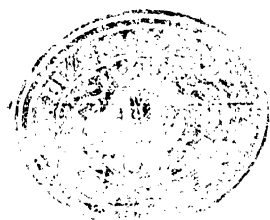
অর্থাৎ

উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টাদশপর্ব্ব।

নূতন উপন্যাস। মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে।

কালাচাঁদে বহুসংখ্যক ছবি থাকিবে। প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠায় পূর্ণ হইবে। খণ্ডে খণ্ডে মাসে মাসে কালাচাঁদ বাহির হইতেছে। তিন খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে ;—

১ ম খণ্ড	মূল্য ॥০	ডাঃ মাঃ ⁄১০
২ য় খণ্ড	মূল্য ।৶০	ডাঃ মাঃ ⁄১০
৩ য় খণ্ড	মূল্য ॥০	ডাঃ মাঃ ⁄১০

এইরূপ অন্যূন বার খণ্ডে কালাচাঁদ শেষ হইবে।

কালাচাঁদ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মত।

সোমপ্রকাশ। (২০ শে ফাল্গুন)

বর্ণনার চাতুর্য্য, ভাষার লালিত্য, চরিত্রের স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি যে সকল গুণে উপন্যাস আদরণীয় হইতে পারে, ইহাতে তাহার প্রায় সমস্তই পরিলক্ষিত হইল। পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্তার নাম প্রকাশিত নাই ; কিন্তু তিনি যে একজন বিচক্ষণ লেখক, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি।

ঢাকা প্রকাশ। (২৮ শে মাঘ)

বঙ্গবাসীর রত্নগর্ভা কার্য্যভূমি কালাচাঁদের প্রসূতি। ইহা মাসে মাসে এক এক পর্ব্ব করিয়া অষ্টাদশ পর্ব্বে শেষ হইবে ; কিন্তু ইহার একটি পর্ব্বই পর্ব্বতের ন্যায় নানারত্নের খণি। সুন্দর সুন্দর ছবি, সুন্দর ছাপা ও সুন্দর কাগজে এরূপ সুবৃহৎ উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। উপন্যাস খানিতে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাজান হইয়াছে ; এবং ইহা পাঠকালে আমরা যেন প্রকৃত সত্য ঘটনা দেখিতেছি বলিয়া বোধ হয়।